ভারতের একতা

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম. এ.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

[illegible] [illegible]

কাশীমবাজার
সত্যরত্ন প্রেস হইতে
শ্রীললিতমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান
Students' Library
67 College St.
Calcutta.

নিবেদন

এই দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে যাদের অন্নবস্ত্রাভাব হৃদয়ের বল ও অন্তরের আনন্দ আজ পর্য্যন্ত দূর করিতে পারে নাই, বাহ্য জীবনের গভীর নৈরাশ্য ও অবসাদে যারা আত্মপ্রসাদ হারায় নাই, প্রকৃতি ও ভগবানের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ সত্য ও জীবন্ত, আমার জাতির অন্তরতম প্রাণ—যারা আমার আদর্শ, আমার নারায়ণের প্রতিরূপ, যারা আমার ভক্তি ও পূজার পাত্র, ভারতের সেই বেদনায় চিরমূক জনসাধারণকে আমার ভক্তির নিদর্শন ও পূজার চিহ্ন স্বরূপ তাহাদেরই নামে ও উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রচার করিলাম।

বিদ্যুৎ আর বজ্রাগ্নিকে ঘনিয়ে তুলছে, যাদের বংশপরম্পরাসঞ্চিত অপমান ও অভিমান ভাগ্যদেবতাকেও বিদ্রূপ করছে, তাদের এই

চিরন্তন ক্রন্দন

তাঁদেরই পুণ্যনামে উৎসর্গ ক'রলাম। যাঁরা এক দিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই ক্রন্দনে নিজেদের নানা কর্ম্ম, নানা স্বার্থ হ'তে মুখ তুলে সতৃষ্ণনয়নে এদের দিকে চেয়েছেন, অন্ততঃ এক দিনের জন্যও যাঁরা ক্রন্দন হৃদয়ে অনুভব ক'রে অন্ততঃ এক মুঠোও তুলে রেখেছেন,—এক মুহূর্ত্তের জন্য যাঁদের অশ্রু নিজেকে ছাড়িয়ে পরের জন্য গড়িয়েছে,—

আমার এই দরিদ্র দেশের বুকফাটা অশ্রুর এই এককণা তাঁদের চরণেই উৎসর্গ ক'রলাম।

ভূমিকা

বর্ত্তমান দারিদ্র্য-সমস্যা এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের সহিত দেশের জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্য রাখিয়া বৈষয়িক উন্নতিসাধনের পন্থা ইঙ্গিত করিয়াছি। শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ-সংস্কার-ক্ষেত্রের মত বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অনুকরণের ভুল দেখাইয়া জাতীয় বৈষয়িক আদর্শের ক্রমবিকাশ সাধনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মত ভারতীয় বৈষয়িক তন্ত্রের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে—দুঃখের বিষয় এই বৈষয়িক যুগেও দেশে ভারতীয় বৈষয়িক তত্ত্ব এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তায় আমরা বিদেশীমোহে মুগ্ধ, আর কার্য্যে আলস্য ও জড়তায় আচ্ছন্ন। বিদেশী নাগরিক আদর্শের এখন প্রতিপত্তি। পল্লীগতপ্রাণ ভারতীয় সভ্যতায় পল্লী-সমাজের অবনতিতে শুধু চিন্তারাজ্যে নহে, বৈষয়িক-ক্ষেত্রেও বিশেষ দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইয়াছে। দেশের দারিদ্র্যের সহিত পল্লীর অবনতির যে যোগাযোগ আছে তাহা দেখাইয়া পল্লীসমাজের উন্নতি ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন এখনই না করিলে আর দেরী সহিবে না। প্রত্যেক জিনিষের একটা সীমা আছে, আমাদের দারিদ্র্য সেই সীমাতেই পৌঁছিয়াছে। হয়তঃ অতিক্রম করিয়াছে।

বৈষয়িক তত্ত্ববিষয়ক আমার সব আলোচনাই ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী' 'গৃহস্থ' 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। "পল্লী-সেবক" সাহিত্য সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে ও "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা" উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। অনেক পত্রিকাতেই সে সময় এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। বিশেষতঃ 'পল্লীসেবক' স্বতন্ত্রভাবে চতুর্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছে। বাকী অধ্যায়গুলি বহরমপুর-শাখা-সাহিত্যপরিষদের অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম অথবা পরিষদের মুখপত্র "উপাসনা"র "আলোচনীর" জন্য লিখিয়াছিলাম। কাশীমবাজারের মহারাজা মাননীয় স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বহরমপুর পরিষদের প্রায় সকল অধিবেশনের সভাপতি থাকিয়া আমার প্রবন্ধ পাঠ শুনিয়াছিলেন। আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া এবং বহরমপুর পরিষৎ হইতে এই পুস্তকের প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বহরমপুর পরিষদের সম্পাদক প্রবীণ লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকের কিয়দংশের প্রুফ দেখিয়া দিয়া এবং আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট কয়েক স্থানে ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে ঋণপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

আচার্য্য ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বৈষয়িক তত্ত্ব লইয়া আমাকে অনেক উপদেশ দেন। আমার ইংরাজীগ্রন্থ "The Foundations of Indian Economics" (লংম্যানস কর্ত্তৃক যাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে) প্রণয়নকালে তাঁহার নিকট যে

সাহায্যলাভ করিয়াছিলাম. বলা বাহুল্য বর্ত্তমান পুস্তক রচনার সময়ও তাহা হইতে বঞ্চিত হইনাই। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সাহায্য ও উৎসাহ ভুলিবার নহে। তিনি সুদূর ইংলণ্ড আমেরিকা, ও জাপানে থাকিয়াও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। যদি দরিদ্রের ক্রন্দন দেশবাসী সকলে শুনে তবেই তাঁহার মত লোকের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি।

দারিদ্র্য লইয়া শুধু কি অভাবক্লিষ্ট শিল্পী, বা ধনবিজ্ঞানবিৎ আলোচনা করিবেন ? শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি এমন কি ধর্ম্মের উন্নতি দারিদ্র্য-মোচন না হইলে অসম্ভব। শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক আর কতকাল শুধু কল্পনারাজ্যেই ঘুরিবেন ? বাস্তবরাজ্যে একবার নামুন, বাস্তবের হাহাকার দুঃখ বেদনার মধ্যে শিক্ষার ফল, বা ধর্ম্মের ভাবুকতা পাইবার কেহ কি কখনও আশা করেন ?

দেশের সাহিত্যও এই বাস্তবকে আশ্রয় করুক। বাস্তবকে হীন ও হেয় বলিয়া উড়াইয়া দিবার ফলে বর্ত্তমান সাহিত্য কৃত্রিম হইতে চলিয়াছে। সাহিত্যের হইতেছে বাস্তব, তাহাকে ছাড়িয়া ভাবরাজ্যের কলা ও সৌন্দর্য্যের উপাদানকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের জীবনী শক্তির হ্রাস লক্ষিত হইয়াছে।

সাহিত্যের পক্ষেও মঙ্গল, দেশের পক্ষেও মঙ্গল বাস্তবকে সকলে দেখুক, চিনুক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন করুক। বাস্তবের এখন একমাত্র নিদর্শনই হইয়াছে, অভাবের

নিদারুণ অভিযোগ, অনশন ও অর্দ্ধাশনের হাহাকার। সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠুক। সাহিত্যের ভিতর দারিদ্র্যের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিপ্রাণকে স্পর্শ করিয়া দেশের জ্ঞানী ও কর্ম্মীকে কল্পনা ও আলস্য হইতে জাগ্রত করুক। বর্ত্তমানে বঙ্গসাহিত্য বহুমুখী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু আধ্যাত্মিক অভাব অভিযোগের অপেক্ষা আধিভৌতিক অভাব এতই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে যে আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে এই উপচীয়মান দারিদ্র্যের আক্রমণে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ত দূরের কথা জাতীয় অস্তিত্বের বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইবে। অন্নসংস্থান যদি না হইল তাহা হইলে কি হইবে আমার সাহিত্য কলা বিজ্ঞান দর্শন লইয়া? আমার নিজের দেহের লজ্জাই যদি একখানা মোটা বস্ত্রে দূর করিতে না পারি, জগতের মহাজাতি সভায় তবে আমার সাহিত্য ও দর্শনের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে বক্তৃতা দ্বারা প্রচার করিবার জন্য কি হইবে প্রতিনিধি পাঠাইয়া?

আমার আজকাল যাহা প্রতিদিনকার অতি দুঃখের কথা, অতি লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, সেই জাতীয় দারিদ্র্য, আমার বাস্তবজীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের বেদনা, আমার অভাবাহত চৈতন্যের হাহাকার, আমার সাহিত্যের অন্তরে প্রকাশিত হয় নাই কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গের কৃষক", দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ," লালবিহারী দের ইংরাজী "গোবিন্দসামন্ত" সাহিত্যে যে সমবেদনা ও সহানুভূতির সুর জাগাইয়াছিল, সে সুর বন্ধ হইয়া গেল কেন? এখনত আরও অভাব, আরও বেদনা আরও হাহাকার।

আরও সমবেদনা, আরও সহানুভূতি এখন চাহি—কোথায় পাইতেছি? আমরা হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছি। হৃদয় চাই প্রেম চাই। প্রেমধারায় সমগ্র সমাজকে ভাসান চাই। দরিদ্রের আকুল ক্রন্দন ভগীরথের শঙ্খনিনাদের মত দেশের নূতন সাহিত্যধারাকে আহ্বান করিতেছে। নূতন সাহিত্য আমার দেশের কর্ণে প্রেমের পতিতোদ্ধারণ মন্ত্র শুনাইয়া তাহাকে ভাবতরঙ্গোচ্ছ্বসিত পূত প্রেমধারায় অভিষিক্ত করিয়া, সুজলা সুফলা বিচিত্র ফল পুষ্প সম্পদ সৌন্দর্য্যে শোভিত করিয়া বিশ্বমানবের মহাসাগর সঙ্গম তীর্থের সঙ্গে তাহার যোগ স্থাপন করুক।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
সন ১৩২২ সাল।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

দরিদ্রের ক্রন্দন

প্রথম অধ্যায়

বর্ত্তমান দারিদ্র্য-সমস্যা

সমাজ বিজ্ঞান

জাতীয় জীবনের উদ্বোধনের দিনে মনুষ্যের শক্তি বিভিন্ন দিকে নিয়োজিত হয়, তাই আজ আমাদিগের দেশে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্য নূতন আন্দোলন এবং উন্নতির চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। কোথাও কলাবিদ্যার নূতন প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি চেষ্টা, কোথাও বা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী ইতিহাসের সৃষ্টি, কোথাও সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলন, আবার কোথাও বা আধ্যাত্মিক জীবনের নূতন উন্মেষ। আজকাল সমাজের বিভিন্ন শাখায় স্বতন্ত্রভাবে উন্নতির আয়োজন দেখা গিয়াছে,—বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন শক্তিগুলিকে সমগ্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা সামাজিক জীবনে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এবং উন্নতির সূচনা দেখি।

প্রাণবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আজকাল ইউরোপে কেহই সামাজিক জীবন পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন না। মানবসমাজের সহিত জীবদেহের সাদৃশ্য আছে, পার্থক্যও আছে। সামাজিক ঘটনাগুলি মনুষ্য এবং পারিপার্শ্বিকের ঘাত প্রতিঘাতের ফল। জীব যেমন পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়, সমাজের ভাব এবং কর্ম্মও সেরূপ পারিপার্শ্বিকের সহিত প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের উপর প্রভাব বিস্তার এবং তাহার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষের আছে, ইতর জীবের সে ক্ষমতা নাই। সামাজিক জীবন ও প্রাণীজীবনের এইস্থানে প্রভেদ, প্রাণবিজ্ঞানের সহিত সমাজ-বিজ্ঞানের বৈষম্য এই খানে। মানুষের ক্ষমতার ত ইয়ত্তা নাই, তাহার আত্মা আছে, আত্মার অনুভূতির কোন্ সীমা নাই। তাহার বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধির দ্বারা পারিপার্শ্বিকের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে তাহারও কোন সীমা নাই। সমাজকে শুধু প্রাণীদেহের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। দেহের বিভিন্ন অংশের যেরূপ সম্বন্ধ, সমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সেরূপ একটি ভাব যে পরিলক্ষিত হয় তাহা সত্য, কিন্তু সমাজ যে শুধু ব্যক্তি-জীবনের সমষ্টি তাহা নহে, ইহা বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পর সংঘর্ষণের প্রতিক্রিয়া, উহাদিগের বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের ফল, ইহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব (social personality) এবং স্বতন্ত্র বুদ্ধি (social will) আছে, ইহার অভিব্যক্তিও স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম, দুই প্রকার।

অর্থবিজ্ঞান ও অভাবতত্ত্ব

এক্ষণে বৈষয়িক জীবনের সহিত সমাজবিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ তাহা দেখিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অথবা বেষ্টনীর প্রভাবে অভাবের উৎপত্তি। উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীজগৎ বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি অবস্থা বা বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, মনুষ্যজগতে এইগুলিকে আমরা অভাব বলি। এই অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ কর্ম্মতৎপর হয় এবং মনুষ্য-সমাজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে আপনার শক্তি নিয়োগ করে। বিভিন্ন প্রকারের অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের উপযোগী বিভিন্ন শাখার প্রয়োজন। মানুষ আপনাকে কখনই পঙ্গু করিয়া সসীম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে ভালবাসে না। ক্ষুদ্র চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মজীবনের মধ্যে থাকিয়া তাহার মনে অতীন্দ্রিয় অনন্তকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিবার যে একটা অভাব স্বভাবতই জাগরিত হইতেছে তাহা পূরণ করিবার জন্যই ধর্ম্মজীবন। তাহার স্নেহ ও প্রেমের বিকাশের জন্য তাহার পারিবারিক জীবন। বহিঃ এবং অন্তঃশত্রুর কবল হইতে সমাজ রক্ষা এবং সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রজীবনের সৃষ্টি। এইরূপে বিভিন্ন জাতীয় অভাব পূরণের জন্য সামাজিক জীবনের কর্ম্মের বৈচিত্র্য, সমাজের বিভিন্ন বিভাগ। মনুষ্য তাহার সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মশক্তি লইয়া কোনটী ধর্ম্মজীবনে কোনটী গার্হস্থ্যজীবনে, কোনটী বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে অথবা শিল্পকলাবিদ্যা এবং বিজ্ঞান-সাহিত্য আলোচনায় নিয়োগ করিতেছে। সমাজের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই।

সভ্যতার নিয়মই এই যে অভাবসমূহ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অভাবগুলি গঠিত হয়, মনুষ্যের শক্তি নিয়োগে উহারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট এবং উন্নত হইয়া পারিপার্শ্বিকের ভাব এবং শক্তি-সমূহের গতি ও পরিবর্ত্তনের অনুগমন করে।* এরূপ বেষ্টনীর প্রভাবে সমাজের ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সাধিত হয়। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মকর্ম্ম, শিক্ষার ব্যবস্থা, সাহিত্যচর্চ্চা, বিজ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি মনুষ্যের মার্জ্জিত এবং মানসিক অভাব মোচনের সহায় হয়, কায়িক অভাবগুলির জন্য সংসারে কৃষিশিল্পকলাবাণিজ্যাদির সৃষ্টি এবং বিরাট আয়োজন। এগুলি লইয়াই আমাদের বৈষয়িক জীবন, কায়িক অভাবতত্ত্বই অর্থ-বিজ্ঞানের মূল কথা।

যে দেশের বিভিন্ন দর্শনের একই মূল কথা এই যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতেই মনুষ্যের আনন্দ, দৈহিক অভাবগুলি যত পরিমাণে খর্ব্ব হয় ততই মনুষ্যের আনন্দের কথা, সে দেশে কায়িক অভাব পূরণকে মূলতত্ত্ব করিয়া যে অর্থবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইবে ইহা অনেকে সমাজের হিতকর মনে না করিতে পারেন। কিন্তু আধুনিক ভারতবাসী জানেন না যে ভারতবর্ষেই অর্থবিজ্ঞানের † প্রথম সৃষ্টি।

* গতিবাদ অর্থবিজ্ঞানের (Dynamic Economics) ইহাই মূল তথ্য। পাশ্চাত্য জগতের দুই একজন ধনবিজ্ঞানবিৎ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আমেরিকার অধ্যাপক Patten এবং ইতালীর অধ্যাপক Pantaleoni প্রধান।

† বার্ত্তাশাস্ত্র।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল যখন ইউরোপে প্রচার করিতে-ছিলেন যে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ কেবলমাত্র সামাজিক জীবনেই সম্ভব, কারণ সমাজ মনুষ্যের অভাববৃত্তিনিচয় মোচন করিবার স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই, এখন হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ম্মবীর ও সাম্রাজ্যসংস্থাপক বাৎস্যায়ন বলিয়াছিলেন, "মনুষ্যানাং বৃত্তিরর্থঃ - মনুষ্যবতীভূমিরিত্যর্থঃ। অর্থএব প্রধানঃ ইতি কৌটিল্যঃ—অর্থমূলৌ হি ধর্ম্মকামাবিতি।" সমাজ রক্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ইহাদিগের মধ্যে অর্থই সর্ব্বপ্রধান। এরূপে বাৎস্যায়ন এবং আরিষ্টটল উভয়েই বিভিন্ন দেশে একই রূপ গবেষণার দ্বারা সমাজতত্ত্ব এবং অর্থবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া-ছিলেন।

দৈহিক ও মানসিক অভাব

মনুষ্য যতক্ষণ তাহার দৈহিক অথবা প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন না করিতে পারে ততক্ষণ তাহার উচ্চবিধ অভাব অনুভব করিবার অবকাশ থাকে না। মনুষ্য শরীরী, এ জন্য শারীরিক অভাবগুলি অন্যবিধ অভাব অপেক্ষা তাহার উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলেরই সংস্থিতি-হেতু প্রাণ। এ জন্য প্রথম শ্রেণীর শারীরিক অভাবগুলি মোচন না করিয়া মনুষ্য মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অভাবগুলি তৃপ্ত করিতে প্রয়াসী হয় না। দারিদ্র্য হেতু

যদি নিম্নশ্রেণীর অভাবগুলি তৃপ্ত না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তি বিকাশলাভ করিতে পারে না, এরূপে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজে নিম্নস্তরের মধ্যে কত লোকের যে ফুটন্ত প্রতিভা দারিদ্র্যের কঠোর অত্যাচারে অচিরেই শুকাইয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্য জগতের দারিদ্র্যের পুরোহিত ভিক্তর হ্যুগো (Victor Hugo) এই হতভাগ্যদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, কোমল পুষ্পের মত ইহাদিগের অন্তঃকরণ আলো পাইয়া যেমন ফুটিয়া উঠিতে থাকে অমনি দারিদ্র্যের তীব্র তাড়না ফুলগুলিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া নিষ্ঠুরভাবে রাস্তায় নিক্ষেপ করে, ম্লান এবং কর্দ্দমাক্ত হইয়া কেবল গাড়ীর চাকায় ছিন্ন হইবার জন্যই উহারা সারাজীবন অপেক্ষা করে। মানুষ তখন সমাজে থাকে না, সমাজ যেমন তাহাকে ঘৃণা করে তাহারও সেরূপ সমাজের উপর আক্রোশ, তখন হতভাগ্য এবং জঘন্যে কোন প্রভেদ থাকে না, the unfortunate and the infamous are mingled and confounded in one word, the fatal word *les miserables*.

জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশে মনুষ্যত্ব

আবার শুধু প্রাথমিক অভাব মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানসিক শক্তির বিকাশ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে তাহাও বলা যায় না। যে ব্যক্তি স্বাভাবিক অভাবগুলি তৃপ্ত করিয়াই সন্তুষ্ট, উচ্চবিধ অভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, তাহার আর উন্নতি কোথায়? সেইজন্য কথায় বলে, Better to be Socrates dissatisfied

than to be a pig satisfied—অজ্ঞের সুখ অপেক্ষা জ্ঞানীর নিরানন্দ ভাল। জ্ঞানের পরিসর যতই বাড়িতে থাকে ততই নূতন নূতন মার্জ্জিত অভাবের সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের মত মানুষের আশাও অতৃপ্ত এবং অনন্ত। জ্ঞানের বিকাশ হইলে মানুষ কায়িক অভাব মোচন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, তখন তাহার আত্মার অনুভূতি হয়। আত্মার ধর্ম্মই এই যে সে কখনই সন্তুষ্ট থাকে না, অতৃপ্তি ও আশা তাহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। "নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্।" আত্মার আনন্দ তখনই যখন সে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, এই পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিবার জন্যই সে সমস্ত ক্ষুদ্র সুখকে অবহেলা করিতে প্রস্তুত হয়। দেহের সুখ হইলে যদি মানুষের পরম আনন্দ হয় তাহা হইলে মানুষ এবং পশুতে প্রভেদ কি? মানুষ জ্ঞান অন্তরাত্মার দ্বারা ইহা বুঝে, তখন সে দৈহিক সুখদুঃখকে তাহার খর্ব্বতার চিহ্ন মনে করে, যাহা কিছু তাহার আত্মাকে সেই পূর্ণ আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখে তাহাই তাহার শৃঙ্খল হয়। এ শৃঙ্খল না ভাঙ্গিলে মানুষের অনন্ত ধনভাণ্ডার সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য বৃথা হয়।

আধ্যাত্মিকতার অভাবে পাশ্চাত্য বৈষয়িকজীবনে অশান্তি

ইউরোপ এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে পারে নাই। ইউরোপে অসংখ্য লৌহকলকারখানা, বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার, অসংখ্য রঙ্গশালা,—কায়িক অভাব মোচন ও আমোদ আহ্লাদের সেখানে কি বিরাট আয়োজন!

অসংখ্য জাহাজ, অসংখ্য রেলগাড়ী, বোঝাই হইয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে ইউরোপের প্রমোদের উপকরণ জোগাইতেছে। ইউরোপ পৃথিবীর যেন একটি প্রকাণ্ড বিলাসভবন। কিন্তু তবুও উহার সুখ কোথায়? বহু লোক যেমন ভোগবিলাস ছাড়া আর অন্য কিছুতে প্রবৃত্ত নহে, অপর দিকে তেমনই অসংখ্য লোক ভোগ জোগাইবার জন্য অহোরাত্র কলকারখানায় খাটিয়া মরিতেছে। আমেরিকা প্রদেশে প্রত্যেক একশত পরিবারের মধ্যে কেবলমাত্র একটী পরিবারের ধনসম্পত্তি অবশিষ্ট ৯৯ পরিবারের ধনসম্পত্তি অপেক্ষা অধিক। ৯৯টী পরিবার একটী মাত্র পরিবারের বিলাস এবং সৌখীনতার উপকরণের জন্য কলকারখানায় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।* সেখানে কলকারখানায় কাজ করা ভিন্ন উপায় নাই। দ্রব্যোৎপাদনে কলের সাহায্য লইতেই হইবে, শেষে মানুষ রাত্রি দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কল চালাইতে চালাইতে কলের মত অন্তঃসারশূন্য জড়পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। কারখানায় একটীমাত্র হাতল একই ভাবে সমস্ত দিন ঘুরাইতে হয়, শ্রমজীবী-দিগের মস্তিষ্ক চালনা অনাবশ্যক, অভ্যাস অভাবে উহাদিগের বুদ্ধি-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, একটি মাত্র হাতল ছাড়া জীবনের মধ্যে অন্য কিছু অনুভব করিবার শক্তি লোপ পাইতে থাকে, তখন জীবনে বৈচিত্র্য থাকে না, জীবনযাত্রা কঠোর এবং দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। এইরূপে ইউরোপ সভ্যতা এবং উন্নতির ভান করিয়া

* Spahr: An Essay on the Present Distribution of Wealth in the United States.

অসংখ্য লোকের মনুষ্যত্বকে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়ন করিতেছে, বিলাস-পূজার বিপুল মণ্ডপে অসংখ্য লোককে মূঢ়, মূক এবং অসহায় ছাগশিশুদের মত প্রত্যহই বলি প্রদান করিতেছে। মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যদিগের ক্রন্দন ও আক্রোশের ধ্বনি শুনা যায়, তখন ধনী সম্প্রদায় উহাকে socialism, anarchism বলিয়া বিদ্রুপ করে। মনীষী পণ্ডিতেরা কিন্তু এই অস্ফুট রোদনধ্বনিতেই ইউরোপের সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া মনে করিতেছেন। বাস্তবিক ইউরোপের বৈষয়িক জীবনে একটা সমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দরিদ্র এবং ধনীদিগের মধ্যে ব্যবধানটা যখন খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে, তখন সমাজে নূতন করিয়া ভাঙ্গা গড়া হইবেই। ইউরোপে ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন অনেকেই এখন শুধু বিলাস ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন দাবীই মানে না, ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে দৈনন্দিন সুখ দুঃখ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, দরিদ্র সম্প্রদায়ও সেরূপ সমাজের ধনীব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিতেছে। রাজশাসন না মানিয়া দেশের সমস্ত শ্রমজীবিশক্তিকে সমবেত করিয়া বিরাট বিদ্রোহ সূচনার আশা করিতেছে। যেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সেখানে শ্রমজীবীরা আরও শীঘ্র সফলকাম হইবে আশা করিতেছে, শ্রমজীবীরা যদি সমবেত হইয়া বারংবার socialismএর জন্য দাবী করে তাহা হইলে রাজশাসন যে অচিরেই উহাদিগের মতানুযায়ী হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইতিপূর্ব্বেই আমেরিকা প্রদেশের ধনীসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে trust সম্বন্ধীয় আইন জারী হইয়া গিয়াছে, ইংলণ্ডে মিঃ Lloyd

George নূতন প্রণালীতে কর স্থাপন করিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি জার্ম্মানীতেও socialism মতাবলম্বীদিগের দল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অভাব-অর্চ্চনার বিষময় ফল

বৈষয়িক জীবনের এই ঘোর অশান্তির মূলে—জীবনে আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ অভাব। মানুষ যদি অভাবের পর অভাব মোচন করিয়া ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়বিষয়ক অভাবের সৃষ্টি করিতে থাকে, উচ্চবিধ আধ্যাত্মিক অভাব কল্পনার জন্য তাহার যদি অবসর না থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিণতি কোথায়? অভাবের নিত্য নূতন দাবী শুনিতে গেলে বিরাট কলকারখানার আয়োজন চাই, বিরাট কলকারখানাগুলি ঐশ্বর্য্যের অধিক তারতম্য সৃষ্টি করে,—মুষ্টিমেয় লোক খুব অর্থোপার্জ্জন করে কিন্তু সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই নিঃস্ব হয়, কারখানায় অর্থোৎপাদনের (factory system) ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। কারখানা স্থাপন করিয়া মানুষ যে অভাব মোচনের শ্রেষ্ঠ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে তাহা নহে, কতকগুলি অভাব মোচন করা হইবে সত্য, কিন্তু আরও নূতন নূতন অভাব দেখা যাইবে, পুরাতন অভাব লোপ পাইবে। আবার এক প্রকার বস্তুর দ্বারা যে প্রতিদিনই একই প্রকার অভাব মোচন করা যাইবে তাহাও নহে। এইরূপে অভাব মিটিবার কোন আশাই থাকিবে না, অথচ সমাজের অভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইলে অনেক কারখানা বন্ধ হইবে, কত অর্থ যে নষ্ট হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক বোধ ও অভাব দমন

অভাব মিটাইবার একটা খুব সহজ পন্থা আছে,—তাহা অনুসরণ করিলে সুখশান্তির জন্য আর লালায়িত হইতে হইবে না। অভাবকে অভাব বলিয়া না মানা। কতকগুলি অভাব যে অদম্য ইহা সত্য, যেমন অশন, বসন, বাস; অন্য অভাব অপেক্ষা যদিও ইহারা প্রবলতম, তথাপি ইহাদিগেরও একটা সীমা আছে। সে সীমা সহজে অতিক্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। অন্য অভাবগুলি শুধু ভোগবিলাসের জন্য,—ইহাদিগের সীমা নাই, যতই মোচন করিবে ততই ইহাদিগের দাবী বিচিত্র, অন্যায় এবং অসম্ভব হইয়া বাড়িয়াই চলিবে। ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক বোধের ফলে এ প্রকার অভাবগুলিকে অবহেলা করিতে শিখিয়াছে। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক বোধ দুর্ব্বহ জীবনকে অনেক পরিমাণে সুখী করিয়াছে, এ আধ্যাত্মিক বোধ না হইলে জীবনে অভাবের আধিপত্য হইতে কখনও নিস্তার এবং শান্তি নাই।

দারিদ্র্য হেতু বৈরাগ্যের ব্যর্থতা

কিন্তু আমরা যতই বলি না কেন যে আধ্যাত্মিক সুখেই পরম সুখ, আমরা যদি আমাদিগের দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখি তাহাদিগের অন্নবস্ত্রের অভাবই এখন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। যাহার আছে সেই ত্যাগ করিতে পারে, ত্যাগের মহিমা বুঝিতে পারে; কিন্তু যাহার অভাব সে বৈরাগ্যের মর্ম্ম কি

বুঝিবে ? তাই আমাদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয় সমাজে অনেক সময়ে বৈরাগ্যের সুফল ফলে না। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে প্রকৃত বৈরাগ্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

দারিদ্র্যের পরিমাণ নিরূপণ

আমাদের সমাজ দারিদ্র্যপীড়িত কিন্তু দারিদ্র্যের গভীরতা এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা না জানিলে ব্যবসায়িক জীবনের উন্নতি এবং নূতন কর্ম্মক্ষেত্র আবিষ্কার একেবারেই অসম্ভব। অভাব বোধ না থাকিলে প্রতিকারের চেষ্টা কখনই হইবে না। দুঃখের বিষয় আমাদিগের দেশে এইরূপ বৈষয়িক তথ্যানুসন্ধানের কোন চেষ্টাই হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রই অর্থবিজ্ঞান পড়িতেছে কিন্তু দেশের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার কোন আগ্রহই দেখা যায় না। ইউরোপে জনসাধারণের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য ধনবিজ্ঞানবিদেরা একটী সুন্দর প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রুশিয়ার গভর্ণমেণ্ট সচিব ডাক্তার Engel এই প্রণালী আবিষ্কার করেন। কি ধনী কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ই আয়ের অধিকাংশ অন্নবস্ত্রাভাব পূরণের জন্য ব্যয় করে। যে সম্প্রদায় যত দরিদ্র, তাহার আয়ের তত অধিক অংশ অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যয়িত হয়। এই তথ্য অনুসারে দারিদ্র্যের পরিমাণ বুঝা যাইবে। ডাক্তার Engel নিম্নে প্রদত্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া ইহা দেখাইয়াছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ে পারিবারিক ব্যয়ের অনুপাত।

Saxony	শ্রমজীবি		মধ্যবিত্ত		ধনী	
১। আহার্য্য	৬২.০	৯৫.০	৫৫.০	৯০.০	৫০.০	৮৫.০
২। বসন	১৬.০		১৮.০		১৮.০	
৩। গৃহ	১২.০		১২.০		১২.০	
৪। ইন্ধন এবং আলো	৫.০		৫.০		৫.০	
৫। শিক্ষা, ধর্ম্মকর্ম্ম	১.০	৫	৩.৫	১০.০	৫.৫	১৫.০
৬। রাজকর	১.০		২.০		৩.০	
৭। চিকিৎসা	১.০		১.০		৩.০	
৮। আমোদপ্রমোদ	১.০		২.৫		৩.৫	
	১০০.০		১০০.০		১০০.০	

তালিকাটী পড়িলেই বুঝা যাইবে যে আয় যে-পরিমাণে বাড়িতে থাকে, শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নূতন নূতন অভাব পূরণ করিবার জন্যও সেই পরিমাণে ব্যয় বাড়িতে থাকে। দরিদ্রেরা অন্নবস্ত্রের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া এই সকল অভাব তাদৃশ মোচন করিতে পারে না।

কয়েক বৎসর হইতে আমি আমার নৈশবিদ্যালয় সমূহের শ্রম-জীবী ছাত্র এবং কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের একটী আদর্শ ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে আমি অনেকগুলি পারিবারিক আয়ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। নিম্নে ইহাদিগের একটী নমুনা দেওয়া গেল—

পারিবারিক আয়ব্যয়ের তালিকা।

১।	স্থান—জেলা, গ্রাম, থানা।	চট্টগ্রাম, শ্রীপুর
২।	বৃত্তি (পেশা)—কৃষি মজুরী, শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী।	কৃষি ও মজুরী
৩।	জাতি	হিন্দু কায়স্থ,
৪।	বাড়ীর লোকসংখ্যা।	৬ জন
৫।	কয়টী ঘর	৫
	(ক) খড়	(ক) ৫
	(খ) খাপড়া	
	(গ) ইট	

	(ঘ) টিন	
৬।	কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে সংসারের কোন কাজ করে)	২ জন উপার্জ্জন করে; বাকী ৪ জন সংসারের কাজ করে।
	(ক) বালক	
	(খ) স্ত্রীলোক	৪ জন
	(গ) পুরুষ	২ জন
৭।	জমি (ক) কত বিঘা	১০ কাণি
	(খ) পতিত, আবাদী, বন, চড়াই, জলা,	পতিত ৩ কাণি আবাদী ৫ কাণি জলা ২ কাণি
	(গ) স্বত্বের বিবরণ লাখেরাজ, মৌরুষী, কর্ষা, কোর্ফা, ঠিকা,	লাখেরাজ, রায়তি
	(ঘ) জমিদারের খাজানা, ও অন্য বাবদে জমিদারকে দেয়।	১৩৲ টাকা, ১৪ আড়ি ধান।
৮।	কৃষক (ক) কিসের আবাদ	বর্ষাকালে ধান্য, অন্য সময়ে মরীচ।
	(খ) কয়খান লাঙ্গল	২ খান লাঙ্গল
	(গ) জমীর জন্য বীজ, সার, মজুর অথবা অন্য খরচ	বীজ ৭॥ আড়ি, মজুরের খরচ ২৪৲ টাকা।

(ঘ) ফসল, নাড়া, বিচালি ইত্যাদি বিক্রয়ের লাভালাভ, বিঘা প্রতি।

৯। শ্রমজীবী, শিল্পী, ও ব্যবসায়ী

(ক) শিল্পী ও শ্রমজীবীর মজুরী অথবা চাউল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কাজ করা।	মজুরী হইতে ২ জনের বার্ষিক প্রায় ৮০৲ টাকা উপার্জ্জন।
(খ) দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা	
(১) হাট কতদিন অন্তর	হাট—চার দিন অন্তর,
(২) মহাজনের নিকট দাদন লইয়া বিক্রয়, কত হারে সুদ।	বাজার—প্রতিদিন। বার্ষিক শতকরা ১৫৲ টাকা সুদ।
(৩) বৎসরে কত বিক্রয়, লাভালাভ।	

১০। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন

(ক) ঘুঁটে অথবা জ্বালানি কাঠ বিক্রয়।

(খ) ধান ভানা, গম পেষা

(গ) সূতা কাটা

(ঘ) মজুরের কাজ

১১। বালকদিগের উপার্জ্জন

১২।	দুগ্ধ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বিক্রয়।	
১৩।	স্ত্রীলোকদিগের গহনা	
	ক) স্বামী বা পিতার নিকট প্রাপ্ত	স্বামীর নিকট প্রাপ্ত, প্রায় ৮০৲ টাকা
	(খ) সোনা রূপা, পিত্তল, কাঁসা, গিল্টি, শাঁখা, কাঁচ বা গালা।	১০৲ টাকা সোনা ৬৭৲ টাকা রূপা ৩৲ শাঁখা
১৪।	মজুত ধান, খড়, নাঁড়া, অথবা অন্য ফসলের পরিমাণ	২০০ আড়ি মজুত ধান, ৫৲ নাড়া
১৫।	ঘটী, বাটী, থালা	ঘটী ৮টা. বাটী ৬টা, থালা ৫ খানা
	(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা	লোহার কড়াই ৩টা
	(খ) মাটী, পাথর	আর সব কাঁসার।
১৬।	কর্জ্জ	১২০৲ টাকা কর্জ্জ
	(ক) কত বৎসরের	চার বৎসরের
	(খ কি হারে সুদ	শতকরা ২০৲ টাকা বৎসরে
	(গ) কি কারণে	চাষের জন্য
	(ঘ) বাকী আসল এবং সুদ	
	(ঙ ধানের বাড়ি	
১৭।	খরচের বিষয়	
	(ক) চাউল, দিনে কয়-বেলা	/৬ সের, দিনে দুই বেলা

(১) তেল (২) মাছ (৩) ডাল (৪) দুধ (৫) লবণ (৬) শাকসবজী (৭) চিনি অথবা গুড়	তেল ১৲ মাছ ২৲ ডাল ৩৲ দুধ ১৲ লবণ ॥০ শাকসবজী ।০ গুড় চিনি ।০—মাসিক।
(খ) কাপড় (বৎসরে কয় জোড়া)	১২ জোড়া কাপড়
(গ) বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ (বৎসরে কয়বার)	বৎসরে একবার খরচ ৬০৲ টাকা
(ঘ) চিকিৎসা	১০৲ টাকা
(ঙ) শিক্ষা	
(চ) মামলা মোকর্দ্দমা	
(ছ) চৌকিদারী রাজকর	
(জ) মাদক দ্রব্য	
(ঝ) বিলাসের সামগ্রী, ছাতা জুতা, জামা ইত্যাদি	ছাতা ২ খানা, জামা ৮টা, বার্ষিক ১৪৲ টাকা

১৮। উদ্বৃত্ত অর্থ, উহার প্রয়োগ।

(ক) গহনা ক্রয়

(খ) ধার-দেওয়া

(গ) ফসল ক্রয়

(ঘ) সেভিংশ ব্যাঙ্কে অথবা অন্য লোকের নিকট গচ্ছিত রাখা

(ঙ) লাঙ্গল, বলদ, জমি, শিল্পীর অস্ত্রপাতী ক্রয়	বলদ ২টী, বৃষ ১টী এবং গাভী ১টী আছে

ভারতীয় শ্রমজীবিগণের ব্যয়ের হিসাব

উপরে যে তালিকাটি দেওয়া গেল সেরূপ অনেকগুলি তালিকার সাহায্যে নিম্নে প্রদত্ত আদর্শ তালিকাটি গঠিত হইয়াছে,

		মজুর		কৃষক		সূত্রধর		কর্ম্মকার		দোকানদার		দীন মধ্যবিত্ত	
১।	খাদ্য	৯৫.৪	৯৯.৪	৯৪.০	৯৭	৮৪.৫	৯৬.৫	৭৯.০	৯০.	৭৭.৭	৮৬.৭	৭৪.০	৭৮.৭
২।	বসন	৪.০		৩.০		১২.০		১১.০		৯		৪.৭	
৩।	চিকিৎসা			১.০		১.০		৫.০		৫.৯		৮.০	
৪।	শিক্ষা									১.০		৩.৩	

৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	.৬	২.০	২.৫	৪.০	৫.০	৮.০
৬। বিলাসের সামগ্রী			১.০	১.০	১.৪	২.০
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শ্রমজীবিগণের বৈষয়িক অবস্থার তুলনা

ইউরোপ এবং আমেরিকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থা তুলনা করিবার জন্য এই দুইটী তালিকা দেওয়া হইল। এগুলি আমেরিকার শ্রমবিভাগের ৭ম বার্ষিক রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক ডলারের মূল্য তিন টাকার কিছু বেশী।

	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডল
আমেরিকা	২০০	৩০০-৪০০	৫০০-৬০০	৭০০-৮০০	৯০০-১০০০	১২০০
১। খাদ্য	৪৯.৫৪	৪৫.৫৯	৪৩.৮৪	৩৮.৮৯	৩৪.৩৪	২৮.৫৩
২। বসন	১২.৮২	১৪.১৪	১৫.২৭	১৬.৩৩	১৬.৮৪	১৫.৭:
৩। আশ্রয়	১৫.৪৮	১৪.৯৮	১৫.১৫	১৫.৫০	১৪.৯৬	১২.০:

৪। ইন্ধন	৭.০৭	৬.০৪	৫.৬৩	৪.৪২	৪.০০	২.৫৭
৫। আলো	১.০১	.৯৮	.৯৭	.৮৮	.৭৪	.৪৫
৬। অন্যবিধ খরচ (চিকিৎসা, শিক্ষা, বিলাসের সামগ্রী)						
মোট	১৩.৯৪	১৮.২৭	১৯.১৪	২৩.৮৮	২৯.১২	৪০.০৫

ইউরোপ	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)
১। খাদ্য	৪৮.৩২	৪৯.৫৮	৫০.৫৬	৪৪.০০	৪৬.২৪
২। বসন	১৯.০৮	১৪.১৮	১৫.২১	১৮.৯৭	১৪.১৫
৩। আশ্রয়	৯.৩৮	১১.৯৩	১০.২৬	৯.৪৯	১০.৪৯
৪। ইন্ধন	৫.৩৮	৫.৪৯	৩.৩২	৩.৯৭	৫.১৯
৫। আলো	১.৬৬	১.৫৯	১.৩৭	১.২০	১.৫৩
৬। অন্যবিধ খরচ (চিকিৎসা, শিক্ষা, বিলাসের সামগ্রী)					
মোট	১৬.১৮	১৭.২৩	১৯.৭৮	২২.৩৭	২২.৪০

ভারতীয় জনসাধারণের কঠোর দারিদ্র্য

তালিকাগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রত্যেক ব্যক্তিরই আয় হইতে অন্নাভাব পূরণের পর অর্দ্ধাধিক অংশ উদ্বৃত্ত থাকে। উহার ফলে ঐসব প্রদেশের জনসাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি উচ্চবিধ অভাবগুলি মোচন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের জনসাধারণের আয়ের এমন কি দশ ভাগের নয় অংশই অন্নাভাব মোচন করিবার জন্য ব্যয়িত হয়, ইহাদিগের উচ্চবিধ অভাব মোচনের অধিক সুযোগ থাকে না,—সমস্ত শক্তিই শুধু ক্ষুধার প্রবল তাড়না নিবৃত্তি করিতে নিয়োজিত হয়। তাহার পর, আমাদিগের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দাবী চিকিৎসা এবং শিক্ষা অপেক্ষা যে অধিক প্রবল ইহা খুব দুঃখের বিষয়। আমাদিগের সমাজ যে কতকগুলি কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের জীবনযাত্রা অধিকতর দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই সকল কৃত্রিম অভাবের ভার না বাড়াইয়া দিয়া যদি সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির যথোচিত চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিত তাহাহইলে বিশেষ মঙ্গল হইত সন্দেহ নাই।

লোকশিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতি

বৈষয়িক জীবনের উন্নতির মূলভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক কৃষি এবং শিল্প-প্রণালী নিয়োগ করিতে পারিলে আমাদিগের দেশের কৃষি এবং শিল্পজীবীগণ দারিদ্র্য হইতে

মুক্ত হইতে পারিবে এবং প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিয়া উচ্চবিধ অভাব পূরণের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিবে।

বৈষয়িক উন্নতি জাতির চরম লক্ষ্য নহে

পাশ্চাত্য জগৎ বৈষয়িক উন্নতিকেই জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিবার সুন্দর পন্থা নির্ণয় করিয়াছে; কিন্তু উচ্চ আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধার ফলে সেখানকার সমাজে কতকগুলি ভয়ানক ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সমাজে অর্থলিপ্সা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধনী ও দরিদ্রদিগের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান খুব অধিক হইয়াছে এবং সমাজে ঘোর অশান্তি ও বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। এই অশান্তি ও বিপ্লবের কারণ কারণ সমাজে একটা ভুল আদর্শের আধিপত্য। বৈষয়িক উন্নতি জাতীয় জীবনের চরম উন্নতি নহে, ইহা একটী উপায় মাত্র। জাতির চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতির মাপকাঠির দ্বারা জাতির বৈষয়িক অনুষ্ঠান এবং অর্থোৎপাদনের প্রণালীগুলি বিচার করিতে হইবে। ইউরোপের অর্থোৎপাদনের প্রণালী এক্ষণে আধ্যাত্মিক জীবনের সহায় হওয়া দূরে থাকুক উহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থোৎপাদন সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনস্ফুরণের উপায় না হইয়া সভ্যতার চরম লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে, অর্থ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া জীবনকে অসুখী করিয়া তুলিয়াছে। জীবনকে আধ্যাত্মিকতার পরম আনন্দের দিকে না লইয়া গিয়া ইউরোপের বিরাট অনুষ্ঠানগুলি ক্রমাগত

উঁহাকে গভীর এবং অনন্ত বেদনার দিকে টানিয়া লইতেছে। অভাবের উপর অভাব-সৃষ্টি, অভাব-অর্চ্চনার নিত্য নূতন প্রণালী এবং বিপুল সমারোহ, সকলি যেন একটি বিরাট বেদনায় পরিসমাপ্ত হইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতে নবযুগের সূচনা

কয়েক মাস হইল জার্ম্মাণীর একজন প্রধান ধনবিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার Emil Hammacher বলিয়াছেন,—'আমরা এতদিন জানি নাই আমাদিগের অর্থলাভের সার্থকতা কোথায়? আমরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি তাহাতে আমরা সুখ পাই নাই। আমরা এখন অন্য প্রকার কিছু চাই। আমরা বুঝিয়াছি আমাদিগের দেশে একটা নূতন যুগ আসিতেছে, এ যুগের আদর্শগুলি আমাদিগের বংশধরগণকে একটা নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে, নূতন যুগের ভাবুকত্ব ও আধ্যাত্মিকতা আমাদিগের বৈষয়িক জীবনের পঙ্কিল স্রোতকে নির্ম্মল করিয়া দিবে, মানুষ তখন প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ অনুভব করিবে'।

বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতের নিকট ভারতবর্ষের বাণী

ইউরোপের দুই একজন পণ্ডিত মাঝে মাঝে যে আশার কথা প্রচার করিতেছেন, আমার বিশ্বাস বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি ভারতবর্ষের সমগ্র জাতীয় জীবনের সেই একই কথা বলিবার

আছে। ভারতবর্ষ অর্থকে কখনও জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মানে নাই, এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত। ইউরোপকে এই আধ্যাত্মিক বোধ শিক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণ। আমরা নূতন নূতন বিজ্ঞান শিক্ষা করিব, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার করিব, দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে রেলগাড়ী চালাইব, লৌহের কলকারখানার বিরাট আয়োজন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিব, গ্রামে গ্রামে দেশীয় শিল্পের সন্ধান করিব তাড়িৎশক্তি এবং ধূমকল দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহাদিগের উন্নতি সাধন করিব,—অসংখ্য কৃষকগণকে যৌথ-ঋণদান-সমিতিতে সমবেত করিয়া মহাজনের ঋণ হইতে মুক্ত করিব, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের আয়োজন করিব এবং এক বিরাট যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া ফসল ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিব, আমরা উন্নত জল-সেচন-প্রণালী নিয়োগ করিব, শুষ্কপ্রায় খাল এবং নদ-নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া আমাদিগের প্রান্তরগুলিকে পুনরায় সুজলা সুফলা করিব, আমরা বিপুল যৌথ ব্যাঙ্কের ধুরন্ধর হইয়া অর্থ সঞ্চয় এবং বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিব,—আমরা অর্থোপার্জ্জনের বিপুল আয়োজন করিব, কিন্তু এই সমস্ত বিরাট বৈষয়িক অনুষ্ঠান-গুলিকে আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না, আমরা কখনই অর্থলোভে মুগ্ধ হইব না, অর্থকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া ধরিব না, কারণ আমাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাস এবং বর্ত্তমানে নিজেদের আধ্যাত্মিক বোধ এই আছে যাহা আমাদিগকে বারংবার বলিয়া

দিবে, "সন্তোষামৃততৃপ্তানাম্ যৎ সুখম্ শান্তচেতষাম্, কুত স্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্", যে সন্তোষ-তৃপ্ত তাহার হৃদয়ে যেমন শান্তি সে শান্তি কি ধনলোভী ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া আশা করিতে পারে ? অর্থ আমাদিগকে ভোগী এবং বিলাসী করিতে পারিবে না, অর্থ দ্বারা আমরা শারীরিক অভাবগুলি মোচন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আরো ক্রিয়াবান্ হইব। অর্থের বিপুল আয়োজনের মধ্যে থাকিয়া আমরা দারিদ্র্যের সম্মান ভুলিব না, কারণ দারিদ্র্যের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি হয় তাহাই ত আমাদিগের সাধনার সামগ্রী। সর্ব্বরত্নবিভূষিতা অন্নপূর্ণার সন্তান হইয়া আমরা সর্ব্বত্যাগী পিতা মহাদেবের পূজা ভুলিব না।

দারিদ্র্য পূজা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মহিমা প্রচার

ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যস্ততাময় কর্ম্মস্রোতের মধ্যে আমাদিগের জাতীয় প্রাণধারা, সেই ধর্ম্মজীবন এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের সাধনা যাহা কোন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গগনে প্রথম প্রভাত উদয়ের সঙ্গে তপোবনে প্রথম সামরবে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ দ্বারা আজও পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাঁহা আরও ক্ষিপ্র গতিতে বহিতে থাকিবে, বিচিত্র বৈষয়িক অনুষ্ঠান এবং নূতন কর্ম্মজীবনের মধ্যে আমাদিগের সাধনা জাতীয় ইতিহাসের বৃহৎ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইবে। আমাদিগের শিল্পকলা অধ্যাত্মসাধনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রাণ পাইয়া বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যকে সুস্পষ্ট এবং ধ্রুবরূপে দেখাইয়া

দিবে, বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মোপলব্ধি সহজ করিয়া দিবে। তখন আমাদিগের সেই অতীত কালের শিল্পকলার আদর্শ আরো মহীয়ান হইয়া উঠিবে,—পদ্মাসীন বুদ্ধ যোগনিমগ্ন হইয়া একটি শতদলের উপর বসিয়া আছেন, শতদল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিহ্ন, তাঁহার দক্ষিণ করতল উন্মুক্ত, উহাতে বিতর্ক মুদ্রাচিহ্ন, তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। স্থির প্রশান্ত পরম ধ্যানের এই আনন্দমূর্ত্তি,—পৃথিবীর অন্য কোন দেশের স্থাপত্যে বা শিল্পকলায় ইহার তুলনা মিলে না। ইহাই ত ভারতবর্ষের অতীত এবং ভবিষ্য জীবনের আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি,—ভারতবর্ষের আপনার তপস্যার ধন, সমগ্র এসিয়ার হৃদয়ে ইহারই অমর সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা। আজ বহু শতাব্দী পর এ মূর্ত্তি আমাদিগকে ভবিষ্য জাতীয় জীবনের পরম সার্থকতার সংবাদ আনিয়া দিতেছে, আমরা বুঝিয়াছি আমাদিগের বিচিত্র কর্ম্মজীবন আমাদিগকে একটী পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতির দিকে লইয়া গিয়া সার্থক হইবে, আমরা ভোগলালসার প্রতি অনাসক্ত হইয়া ভক্তি এবং বৈরাগ্য অনুশীলন করিব,—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ত্যাগের চরম আদর্শ দেখাইব, এবং আকাঙ্ক্ষা-বাসনার বশবর্ত্তী না হইয়া সেই পরম জ্ঞান লাভ করিব যাহা বুদ্ধের এবং প্রত্যেক ধ্যানীর, 'যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি,' যাহা লাভ করিলে মানুষ যাহা কিছু পাইবার তাহা পায়, যাহা পাইলে মানুষ অমর হয় এবং এবং পরম তৃপ্তি অনুভব করে। আমরা জানিয়াছি আমাদিগের বৈষয়িক জীবন বিদেশের মূঢ় এবং অন্ধ অনুকরণ হইবে না, ইহা আমাদিগের আত্মপ্রকাশ এবং আত্ম-

প্রতিষ্ঠার সহায় হইবে, অধ্যাত্মিক বোধকে জাগাইয়া দিয়া ইহা একটা নূতন ধর্ম্মপ্রাণ মহাজীবনের সূচনা করিয়া দিবে। অতীতের ইতিহাসে সমগ্র এসিয়া ভক্তি-অর্ঘ্য আনিয়া যে মূর্ত্তিকে বহু শতাব্দী ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল, আমাদিগের জাতীয় জীবনের সেই অমর মূর্ত্তি আবার দিব্যসৌন্দর্য্য ও বিমল শান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, বিষয়মত্ত ইউরোপ আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসের ভবিষ্য বৃহৎ বিকাশের দিনে সেই ধ্যাননিমগ্ন যোগীর নিকট আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিবে, "যদ্‌জ্ঞানাদ্‌উন্মত্তো ভাবতি স্তব্ধো, পুমানাত্মারামো ভবতি," যে জ্ঞান লাভ করিয়া উন্মত্ত ইউরোপ স্তব্ধ হইবে, আত্মার আনন্দ লাভ করিয়া পরম আনন্দ এবং শান্তি লাভ করিবে।

বিশ্বজগৎকে শান্তিদান বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠদান হইবে, বিশ্বমানবের নিকট ঋণ হইতে ভারতবর্ষ তখন মুক্ত হইবে। বিশ্বদেবতা ভারতবর্ষকে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আহ্বান করিতেছেন, ভারতবর্ষ কি সে আহ্বান শুনিয়া শীঘ্রই কর্ম্মতৎপর হইবে না?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক আয়-ব্যয়।

[বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চুঁচুড়া অধিবেশনে অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের পঠিত প্রবন্ধ অনুসারে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণকে আহ্বান করা হয়, এবং বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের বৈষয়িক তথ্য-সংগ্রহের নিমিত্ত একটি অনুসন্ধান-সমিতিও গঠিত হয়। ঐ সমিতির কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আমি কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রগণকে এই সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে কতকগুলি তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েকটি এই স্থলে প্রকাশ করিলাম। এই উপকরণ-সমূহ বঙ্গভাষায় ধনবিজ্ঞান রচনার সাহায্য করিবে। দেশের আর্থিক অবস্থাও এই তালিকাগুলি হইতে অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।]

(১) শ্রীপুর, পটীয়া, চট্টগ্রাম।

১। বৃত্তি (পেশা)—চাকুরী

২। জাতি হিন্দু

৩। বাড়ীর লোক-সংখ্যা ৬ জন

৪। কয়টী ঘর

(ক) খড় ৩ খান

(খ) খাপড়া ৩ খান

(গ) ইট

(ঘ) টিন

(ঙ) তর্জ্জা

৫। কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে সংসারের কোন্ কাজ করে)—একজন উপার্জ্জন করে, অবশিষ্ট ঘরকন্নার কাজ করে।

(ক) বালক ও বালিকা ১ জন বালিকা

(খ) স্ত্রীলোক ৩

(গ) পুরুষ ১

৬। জমি

(ক) কত বিঘা (কানি)— ভিটা বাড়ী প্রায় ১ কানি

(খ) পতিত, আবাদী, বন, চড়াই

(গ) স্বত্বের বিবরণ— লাখেরাজ

(ঘ) জমিদারের খাজানা—২৸৹

৭। কৃষক

(ক) কিসের আবাদ

(খ) কয়খান লাঙ্গল

(গ) জমির জন্য বীজ, মজুর অথবা অন্যান্য খরচ

(ঘ) ফসল, নাড়া, বিচালি ইত্যাদি বিক্রয়ে লাভালাভ

৮। শ্রমজীবী, শিল্পী, ব্যবসায়ী

(ক) শিল্পী ও শ্রমজীবী ও মজুরী (অথবা চাউল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কাজ করা)

৯। স্ত্রীলোকদিগের গহণা

(ক) স্বামী বা পিতার নিকট প্রাপ্ত,—স্বামীর নিকট হইতে প্রায় ১০৬৲ টাকা

(খ) সোণা, রূপা, পিত্তল, কাঁসা—সোণা ৪৫৲ টাকা, রূপা ৫৬৲ টাকা, ৫৲ টাকা শাঁখা, বালা।

১০। ঘটি, বাটী, থালা—৩, ৬, ৫

(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা—৮, ০, ৬

(খ) পাথর ২ থান

১১। কর্জ্জ ১০০৲ টাকা

(ক) কত বৎসর

(খ) কি হারে সুদ—১২৲ টাকা হারে

(গ) কি কারণে—বাড়ী তৈয়ার করা ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য

(ঘ) বাকী, আসল

(ঙ) বাকী. সুদ

১২। খরচের বিষয়

(ক) চাউল দিনে ২ বেলা—৵৩৶৹

(১) তৈল (২) মাছ তেল ১॥৹ মাছ ॥৹

(৩) দুধ (৪) দাল দুধ ॥৹ দাল ২৲

(৫) লবণ (৬) শাকশব্জী লবণ ৵৹ শাকশব্জী ।৵৹

(৭) গুড়-চিনি গুড় চিনি ।৹

(খ) কাপড় (বৎসরে কয় জোড়া) বৎসরে ১২ জোড়া

(গ) বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ (বৎসরে কত বার)

বৎসরে প্রায় ১ বার ২ বার খরচ ৪০, ৫০ টাকা

(ঘ) শিক্ষা ২৲ টাকা

(ঙ) চিকিৎসা ৫৲ টাকা

(চ) মামলা মোকদ্দমা

(ছ) চৌকদারী

(জ) মাদক দ্রব্য

(ঝ) বিলাসের সামগ্রী ছাতা, জুতা কোট ইত্যাদি—ছাতা ১ খান, কোট ৩টী, জুতা ২ জোড়া বার্ষিক ৯।১০৲ টাকা

১৩। উদ্বৃত্ত অর্থ—উহার প্রয়োজন

(ক) গহণা-ক্রয়

(খ) ধান্য-ক্রয় প্রায় ৩০।৪০৲ টাকা

(গ) ধার দেওয়া

(ঘ) Saving bank অথবা অন্য কোন স্থানে গচ্ছিত রাখা

১৪। লাঙ্গল, বলদ,—

১৫। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন নাই

১৬। বালকদিগের উপার্জ্জন নাই

(২) শ্রীপুর, পটীয়া, চট্টগ্রাম।

১। বৃত্তি (পেশা), কৃষি -

২। জাতি হিন্দু

৩। বাড়ীর লোক সংখ্যা ৭ জন

৪। কয়টী ঘর ৫

(ক) খড় ৫

(খ) খাপড়া

(গ) ইট

(ঘ) টিন

(ঙ) তর্জ্জা

৫। কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে সংসারের কোন্ কাজ করে)—একজন উপার্জ্জন করে, একজন অধ্যয়ন করে, দুইজন ঘরকন্নার কাজ করে।

(ক) বালক, বালিকা ২ + ১

(খ) স্ত্রীলোক ২ জন

(গ) পুরুষ ২ জন

৬। জমি ৫ কানি

(ক) কত বিঘা (কাণি)

(খ) পতিত, আবাদী, বন, চড়াই, জলা—আবাদি ৩ কানি জলা ২ কানি

(গ) সত্ত্বের বিবরণ—

লাখেরাজ রায়তি

(ঘ) জমিদারের খাজানা ৭৲

৭। কৃষক

(ক) কিসের আবাদ
(খ) কয়খান লাঙ্গল
(গ) জমির জন্য বীজ সার মজুর অথবা অন্য খরচ
(ঘ) ফসল নাড়া বিচালী ইত্যাদি বিক্রয়ের লাভা-লাভ

} লাগায়তি

৮। শ্রমজীবী শিল্পী ও ব্যবসায়ী

(ক) শিল্প ও শ্রমজীবীর মজুরি অথবা চাউল ইত্যাদি দ্রব্য লইয়া কাজ করা

চাকুরীতে একজনের বার্ষিক ১৪০ টাকা উপার্জ্জন

৯। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন

(ক) ঘুঁটে অথবা জ্বালানি কাঠ বিক্রয়
(খ) সূতা কাটা
(গ) মজুরের কাজ

১০। বালকদিগের উপার্জ্জন

১১। দুগ্ধ, পশু ইত্যাদি বিক্রয়

১২। স্ত্রীলোকদিগের গহণা

(ক) স্বামীর নিকট প্রাপ্ত—স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রায় ১৫০৲ টাকা

(খ) সোণা রূপা পিত্তল—৮০৲ টাকা সোণা, ৬৫৲ টাকা রূপা, ৫৲ টাকা শাঁখা

১৩। মজুত ধান, খড় এবং নাড়ার পরিমাণ (বা অন্য ফসলের)

১৪। ঘটি বাটি থালা—১০, ১২, ৭

(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা—লোহার কড়াই ৪টী, পিত্তল ৫টী, আর সব কাঁসা

১৫। কৰ্জ্জ

(ক) কত বৎসর—১৪০৲ টাকা

(খ) কি হারে সুদ—শতকরা ১২৲ টাকা হার

(গ) কি কারণে—পরিবার পালনের জন্য

(ঘ) বাকী আসল

(ঙ) বাকী সুদ

(চ) ধানের বাড়ি

১৬। খরচের বিষয়

চাউল (দিনে ২ বেলা)—/৶৹ সের (১) তেল—২৷৹ (২) মাছ—২৲ (৩) দাল—৩৷৹ (৪) দুধ—১৲ (৫) লবণ—১৷৹ (৬) শাকসব্জী—৷৶৹ (৭) চিনি গুড়—৶৹ (মাসিক হিসাবে)

(খ) কাপড় (বৎসরে কত জোড়া)—প্রত্যেকে ২ জোড়া মোট ১৪ জোড়া

(গ) বিবাহাদি বৎসরে (কত বার)—বৎসরে দুইবার খরচ প্রত্যেক বার ৫০।৬০৲ টাকা

(ঘ) চিকিৎসা—১২৲ টাকা

(ঙ) শিক্ষা—২২৲ টাকা বার্ষিক

(চ) মামলা মোকর্দ্দমা

(ছ) চৌকিদারী

(জ) মাদক দ্রব্য

(ঝ) (বিলাসের সামগ্রী) ছাতা, জুতা, কোট ইত্যাদি—ছাতা ২ খানা, জুতা ৪ জোড়া, কোট ৬টা বার্ষিক ১৮।১৯৲ টাকা

১৭। উদ্বৃত্ত অর্থ—উহার প্রয়োগ

(ক) গহণা ক্রয়

(খ) ধার দেওয়া

(গ) ফসল ক্রয়— প্রায় ৫০ টাকা

(ঘ) Saving bank অথবা অন্য রকমে কোন স্থানে গচ্ছিত রাখা

(ঙ) লাঙ্গল বলদ

(৩) শ্রীপুর, পটীয়া, চট্টগ্রাম

১। বৃত্তি (পেশা)—কৃষি ও মজুরি

২। জাতি — কায়স্থ

৩। বাড়ীর লোকসংখ্যা — ছয় জন

৪। কয়টি ঘর — পাঁচ খানা

(ক) খড়

(খ) খাপড়া

(গ) ইট

(ঘ) টিন

(ঙ) তর্জ্জা

৫। কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে সংসারে কোন্ কাজ করে)—২ জন উপার্জ্জন করে, আর বাকী ৪ জন সাংসারিক ও ঘরকন্নার কাজ করে

(ক) বালক

(খ) স্ত্রীলোক ৪ জন

(গ) পুরুষ ২ জন

৬। জমি

(ক) কত বিঘা (কানি) ১০ কানি

(খ) পতিত, আবাদী, বন, চড়াই, জলা—পতিত ৩ কানি, আবাদি ৫ কানি, জলা ২ কানি

(গ) স্বত্বের বিবরণ

লাখেরাজ, রায়তি

(ঘ) জমিদারের খাজনা অন্যবাবদে জমিদারকে দেয় ১৩৲ টাকা, ধান ১৪ আরি

৭। কৃষক

(ক) কিসের আবাদ—বর্ষাকালে ধান্য, অন্য সময়ে মরিচ প্রভৃতি অন্যান্য ফসল

(খ) কয়খানা লাঙ্গল—২ খানা

(গ) জমির জন্য বীজ, সার, মজুর অথবা অন্য খরচ—বীজ ৭॥ আরি, মজুরের খরচ ২৪৲ টাকা

৮। শ্রমজীবী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী—মজুরীতে ২ জনের বার্ষিক প্রায় ৮০৲ উপার্জ্জন

(ক) শিল্পী ও শ্রমজীবীর মজুরী (অথবা চাউল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কাজ করা)

(খ) দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা—যে সময়ে যে রকম ফসল উৎপন্ন হয় তাহা অবস্থানুসারে বিক্রয় করা হয়।

(১) হাট বাজার কতদিন অন্তর—হাট ৪ দিন অন্তর বাজার প্রতিদিন।

(২) মহাজনের নিকট দাদন লইয়া কতহারে সুদ—বার্ষিক শতকরা ১৫৲ টাকা সুদ

(৩) বৎসরে কত বিক্রয়, লাভালাভ

৯। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন

(ক) ঘুঁটে অথবা জ্বালানি কাঠ বিক্রয়

(খ) ধান ভানা, গমপেষা

(গ) সুঁতাকাটা

(ঘ) মজুরের কাজ

১০। বালকদিগের উপার্জ্জন

১১। দুগ্ধ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বিক্রয়

১২। স্ত্রীলোকদিগের গহণা

(ক) স্বামী বা পিতার নিকট প্রাপ্ত, শ্রমলব্ধ—স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রায় ৮০৲ টাকা

(খ) সোণা, রূপা, পিতল, কাঁসা, গিল্‌টী শাঁখা, কাঁচ বা গালা—১০৲ টাকা সোণা, রূপা ৬৭৲ টাকা, শাঁখা ৩৲

১৩। মজুত ধান, খড় এবং নাড়ার পরিমাণ (বা অন্য ফসলের)—২০০ আরি মজুত ধান, নাড়া প্রায় ১৫৲ টাকা

১৪। ঘটি, বাটি, থালা—ঘটী—৮ ; বাটী—৬ ; থালা—৫

(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা—লোহার কড়াই ৩টা, বাকী কাঁসা

(খ) মাটি, পাথর

১৫। কর্জ্জ ১২০৲ টাকা

(ক) কত বৎসর চারি বৎসর

(খ) কি হারে সুদ— বার্ষিক শতকরা ২০৲ টাকা

(গ) কি কারণে চাষের জন্য কর্জ্জ

(ঘ) বাকী আসল

(ঙ) বাকী সুদ

(চ) ধানের বাড়ি

১৬। খরচের বিষয়

(ক) চাউল—/৬ সের দিনে ২ বেলা (১) তেল ২৲ (২) মাছ ২৲ (৩) দাল ৩৲ (৪) দুধ ১৲ (৫) লবণ ॥০ (৬) শাক সব্জী ।০ (৭) চিনি গুড় ৭৲—মাসিক হিসাবে

(খ) কাপড় (বৎসরে কত জোড়া)—প্রত্যেকে ২ জোড়া,

(গ) বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ (বৎসরে কতবার)
—বৎসরে একবার খরচ প্রায় ৬০৲

(ঘ) চিকিৎসা ১০৲ টাকা

(ঙ) শিক্ষা

(চ) মামলা মোকদ্দমা

(ছ) চৌকি, গাড়ী

(জ) মাদক দ্রব্য—আফিং মাসে ১৲

(ঝ) বিলাসের সামগ্রী ছাতা, জুতা, জামা ইত্যাদি—ছাতা ২ খানা, কোট ৮টী, বার্ষিক ১৪।১৫ টাকা

১৭। উদ্বৃত্ত অর্থ—উহার প্রয়োজন

(ক) গহণা ক্রয়

(খ) ধার দেওয়া

(গ) ফসল ক্রয়

(ঘ) Saving Bank অথবা অন্য লোকের নিকট গচ্ছিত রাখা

(ঙ) লাঙ্গল, বলদ, জমি, শিল্পীর অস্ত্রাদি—লাঙ্গল ২ খানা বলদ ২টী, বৃষ ১টী গাভী ১টী

(৪) ফুলবেড়িয়া, ভগবানপুর, মেদিনীপুর

১। বৃত্তি—চাষ ও চাকরী

২। জাতি—মাহিষ্য

৩। আশ্রিত পরিজনের সংখ্যা—২৮

(ক) বালক—১২,

(খ) স্ত্রীলোক—৫ (গ) পুরুষ ১১

৪। ১১ জন পুরুষের মধ্যে ১০ জন উপার্জ্জন করে। উহাদের মধ্যে দুইজন চাকুরী করে ও বাকী ৯ জন চাষ করে।

৫। বাড়ী—(ক) বসত বাটী,

(খ) খড়ের ঘর

৬। (ক) জমি বা আবাদী জমির পরিমাণ—৪০ বিঘা।

রবিখন্দের চাষ

(খ) ৫ বিঘা বসত বাটীর জন্য বাকী ৩৫ বিঘা

(গ) ঐ জমিগুলি মৌরশী সত্ত্বে দখল।

৭। জমিদারকে খাজনা দেওয়ার পরিমাণ—৮২৷৷০

৮। (ক) ২ বিঘা জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হয়। তিন বিঘা জমিতে সরিষা ও আখ হয়। আখ—১ বিঘা ও সরিষা—২ বিঘা

(খ) ৪ খান লাঙ্গল

(গ) বীজ ও সার কিনিতে হয় না। জমি চাষের জন্য মজুর খরচ প্রায় ৪০৲ টাকা

(ঘ) আখের গুড় বিক্রয়ে লাভ প্রায় বৎসরে ৮০৲। কলুর বাড়ী হইতে সরিষার তৈল করিয়া আনা হয়

(ঙ) তিন চার দিন অন্তর হাট বাজার। বৎসরে ধান্য বিক্রয় প্রায় ১০।১২ মণ

৯। স্ত্রীলোকগণ কোনরূপ উপার্জ্জন করে না।

১০। বালকগণও উপার্জ্জন করে না, উহাদের মধ্যে ৪ জন লেখা পড়া করে।

১১। বাৎসরিক চাউলের খরচ—৬০০৲

(ক) মাছ কিনিতে হয় না।

(খ) তৈলের খরচ ১০৲ ; লবণ ৭৷৷০ ; লঙ্কা মশলা ৭৲; চিনি ১২৲

(গ কাপড় বৎসরে প্রায় ৮৯ জোড়া দাম প্রায় ১২২৲ টাকা

(ঘ) শ্রাদ্ধাদির খরচ আন্দাজ ৩৫৲

প্রতি বৎসর বিবাহাদি হয় না।

(ঙ) শিক্ষার খরচ প্রায় ৪০৲

(চ) মোকর্দ্দমা হয় না।

(ছ) চৌকিদারী ৬৲

১২। বিলাসের সামগ্রী ৩০৲

১৩। উদ্বৃত্ত অর্থে গহণা ক্রয় প্রায় ৫০৲

লাঙ্গল বলদাদি ক্রয় ২০৲

১৪। ধান্তের পরিমাণ—২৮০ মণ, দাম ৫৬০৲

১৫। চাকুরীর বাৎসরিক আয় ৮৪৲

১৬। গরু ও বলদের সংখ্যা—১৩ ; তন্মধ্যে বলদ ৮টী

(৫) কলাগেছিয়া, খেজুরি, মেদিনীপুর।

১। বৃত্তি—চাকুরী ও চাষ

২। জাতি—করণ

৩। আশ্রিত পরিজনের সংখ্যা—৭ (ক) বালক ২ (খ) স্ত্রীলোক ২ (গ) পুরুষ ৩

৪। ঘর—(ক) বসত বাটী

(খ) খড়ের ঘর

৫। তিন জন পুরুষের মধ্যে দুইজন উপার্জ্জন করে

৬। (ক) মোট নিজ জমির পরিমাণ ৩॥ বিঘা আর ভাগে আবাদী জমির পরিমাণ ৬ বিঘা

(খ) ৩॥০ বিঘা জমির মধ্যে আবাদি জমি ৩।০ কাঠা আর ঘরের জন্য ।০ কাঠা

(গ) ঐ জমির রাইয়তি সত্ত্বে দখল হইয়া থাকে অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে হয়

(ঘ) জমির মোট খাজনা ৪।৶০ ; রোডসেস ৶০

৭। ক) ৯০ বিঘা জমির মধ্যে ৯ বিঘাতে ধান্য ও ।০ কাঠা জমিতে শাকশব্জী, আলু, বেগুন ইত্যাদি হয়।

(খ) একখান লাঙ্গল

(গ উপরোক্ত জমিতে চাষ করিবার জন্য বীজ কিনিতে হয় না। তবে ৯ বিঘা জমিতে চাষ করিতে দুই মণ বীজ লাগে

(ঘ) ঐ ফসল বিক্রয় করা হয় না

(ঙ) বৎসরে ব্যবসায়ে ও চাকরীতে আয় প্রায় ৬৬৲

৮। হাট বাজার চারিদিন অন্তর। ধান্য বিক্রয় করা হয় না।

৯। স্ত্রীলোকেরা উপার্জ্জন করে না

১০। বালকেরা উপার্জ্জন করে না

১১। (ক) বৎসরে চাউল খরচ—১২০৲

(খ) মাছ ২৲ ; সরিষার তৈল ৬৲ ; নারিকেল তৈল ৩৲ ; লবণ ২৲ ; মশলা ১৲ ; লঙ্কা কিনিতে হয় না। চিনিগুড় ৩৲

(গ) কাপড় প্রায় বৎসরে ১২ জোড়া দাম ১৭৲

(ঘ) প্রতি বৎসরে বিবাহাদি ক্রিয়া হয় না। তবে শ্রাদ্ধাদি বৎসরে ৩।৪ বার হয়, আর লক্ষ্মীপূজা, জন্মাষ্টমী রাধাষ্টমী ইত্যাদি পূজা হয়, মোট খরচ—২॥০

(ঙ) চিকিৎসা ২৲

(চ) শিক্ষার জন্য ৮৲

(ছ) মোকদ্দমার খরচ প্রায় নাই, চৌকীদারী ট্যাক্স ॥/০

(ঝ) বিলাসের সামগ্রী—৫৲

(৬) ফরিদপুর।

১। বৃত্তি—সূত্রধর

২। লোকসংখ্যা—৪

৩। ঘর—টিন ১, খড় ১

৪। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি—১

৫। জমি—সাধারণ কর্ষা—কানি ও বর্গা আবাদী

(ক) কিসের আবাদ—ধান, পাট

(খ) ফসল—ধান, পাট, নাড়া, খড়

৬। বাৎসরিক আয়—১২০৲ টাকা

৭। দুগ্ধ বিক্রয়—৩৬৲ টাকা বৎসর

৮। গহণা—প্রধানতঃ রূপার, সোণার নলক,

৯। মজুত ধান—২।৩ মাসের

১০। ঘটী, বাটী, থালা—পিতল, মাটী

১১। কর্জ্জ—২০০৲

স্থদ—২৲

কর্জ্জের কারণ—বিবাহ ইত্যাদি

১২। খরচ—

চাউল—প্রায় ১৮ মণ বৎসর ৬০৲

তৈল—১২ সের—৬৲

মাছ ৩৲ টাকা

লবণ ২০ সের

কাপড় ৮ জোড়া ৯১৲

চৌকীদারী টেক্স ॥০ আনা

তামাক ১০ সের

ছাতা, জামা ২৲

গরুর আহার খরচ ১০৲ টাকা „

(৮) ফরিদপুর।

১। বৃত্তি—পিতলের কাজ

২। লোক সংখ্যা— ৫

৩। ঘর—খড় ১, টিন ২

৪। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি—১

৫। জমি—

৬। স্বত্বের বিবরণ—সাধারণ কর্ষা

৭। দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা—

৮। বাৎসরিক আয় -প্রায় ১৮০৲

৯। বালকেরা উপার্জ্জন করে না

১০। গহণা—পিতল, কাঁসা কিছু রূপা

১১। ঘটী, বাটী, থালা

(ক) পিতল, কাঁসা, লোহা, মাটী, পাথর

১২। কর্জ্জ—৫০৲

সুদ—১॥০

১৩। কর্জ্জের কারণ—বিবাহ এবং চিকিৎসা

১৪। খরচ—

চাউল	প্রায় ২৪ মণ বৎসর ৮৪৲
তেল—	প্রায় ১২ সের " ৬৲
মাছ—	বৎসর ২৲
ডাল—	" ২০ সের
লবণ—	" ১৮ সের
কাপড়—	" ১০ জোড়া
চিকিৎসা—	" ১০৲ টাকা

শিক্ষা— ৩৲

চৌকিদারী টেক্স ।/০ আনা

তামাক— ৪৲ টাকা

ছাতা, জুতা

ইত্যাদি— ১॥০ „

১৫। সরঞ্জাম ক্রয় ২॥০ „

(৭) ফরিদপুর।

১। বৃত্তি—মজুরী

২। লোকসংখ্যা— ৪

৩। ঘর—২ = টিন ১ খড় ১

৪। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি—১

বালক— ১

স্ত্রীলোক—১

৫। সত্ত্বের বিবরণ

৬। বাৎসরিক আয় ১২৫৲

৭। গহনা রূপার

৮। ঘটী, বাটী, থালা—পিতলের, কাঁসার, মাটীর

৯। কর্জ্জ

১০। খরচ—

চাউল—১৮৲মণ বৎসরে ৫৮॥০

তেল—১০ সের „ ৫৲

	মাছ—	"	১৲
	লবণ—১৮ সের	"	
	কাপড়—৩ জোড়া	"	৩৬৲
১১। উদ্বৃত্ত অর্থ	যৎসামান্য		

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা

অভাবমোচন ও বিলাস

মানুষ তাহার অভাব-মোচন উদ্দেশ্যে রাত্রিদিন পরিশ্রম করিতেছে। সংসারের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ্য মানুষের নানাবিধ অভাব মোচন করা। সহরের কল-কারখানা বা গ্রামের পারিবারিক শিল্পকর্ম্ম, মন্থরগতি গরুর গাড়ী অথবা বেগবান মেল-ট্রেণ, নৌকা বা সামুদ্রিক জাহাজ, মুদীর দোকান অথবা বড় বড় হৌস্ বা ব্যাঙ্ক সবগুলিই মানুষের নানাবিধ অভাব-মোচনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অভাব-মোচনের জন্য সমগ্র সমাজ শ্রমবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে—

(ক)	(খ)	(গ)
কৃষি এবং খনিজ দ্রব্য হইতে দ্রব্য প্রস্তুত করণের উপকরণ সামগ্রী উৎপাদন।	দ্রব্য প্রস্তুত করণ	দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্য

(ঘ)	(ঙ)
ধনোৎপাদন ক্রিয়ার ক্ষতিপূরণ	উদ্বৃত্ত ধনভোগ বিলাস সামগ্রী মূলধন

প্রথমে কৃষিজাত দ্রব্য অথবা খনিজ পদার্থ হইতে দ্রব্য প্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী পাওয়া যায় (ক)। ঐ সমস্ত উপকরণ লইয়া কারখানা-ফ্যাক্টরীতে দ্রব্য প্রস্তুত হয় (খ)। পরে বাণিজ্যের দ্বারা যাহার অভাব তাহার নিকট নীত হইয়া অভাব মোচন করে (গ)। এই তিন প্রকার কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিশ্রম এবং মূলধনের সংযোগ প্রয়োজনীয়। ধনোৎপাদনের জন্য অহোরাত্র যে বিপুল পরিশ্রম লাগিতেছে, উহার বিনিময়ে মানুষ প্রথমতঃ আপনার অভাব মোচন করিতে পারিতেছে। প্রাথমিক অভাব মোচন করিয়া উদ্বৃত্ত ধন হয় বিলাস-ভোগ (ঘ) অথবা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় ধনোৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োগ করিতেছে (ঙ)। শেষোক্ত অর্থপ্রয়োগই সমাজের অর্থবৃদ্ধির বিশেষ সহায় হয়। দুই একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে ; কোন কৃষক শস্য বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ঐ টাকায় যদি একখান লাঙ্গল অথবা জমির উপযুক্ত সার ক্রয় করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার কৃষিকার্য্যে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে। কিন্তু যদি সে তাহা না করিয়া মদ খাইয়া ঐ টাকা খরচ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব পরিশ্রমের কোন চিহ্নই থাকিবে না। সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষণিক আমোদের জন্য অর্থ ব্যয়িত হইল, অর্থব্যয়ের কোন স্থায়ী ফল লাভ হইল না। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন জমিদার কি করিয়া তাঁহার অর্থব্যয় করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। বিদ্যালয়-স্থাপন, পুষ্করিণীখনন, শিল্পব্যবসায়-

প্রবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করা তাঁহার ইচ্ছা, কিন্তু সম্প্রতি পারিষদবর্গের পরামর্শে তিনি নৃত্যগীতাদির জন্য অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন। যেস্থলে অর্থব্যয়ের ফল অধিকালব্যাপী হয় না, তাহাকে আমরা প্রচলিত কথায় বিলাস-ব্যাপার বলিয়া থাকি। নৃত্যগীতাদিতে অর্থব্যয়ের ফল বেশীক্ষণ থাকে না; অপরদিকে সেই পরিমাণ অর্থে যদি একটি ব্যবসায় বা বিদ্যালয় চলিতে থাকে, এই প্রকার অর্থ ব্যবহারের সুফল আমরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। ধনবিজ্ঞানের দিক হইতে শেষোক্ত প্রকার অর্থ-ব্যবহারকে মূলধননিয়োগ [ঙ] বলা হয়। ইহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি অথবা নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। একদিক হইতে দেখিতে গেলে মানসিক অথবা নৈতিক উন্নতি সমাজের ধনবৃদ্ধির উপায় মাত্র।

যেখানে অর্থ-ব্যবহার বৈষয়িক উন্নতির কোন কাজেই আসে না, অর্থ আছে অতএব অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, নিজের বা সমাজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যখন উহা নিয়োজিত হয় না, কেবলমাত্র ক্ষণিক সুখের জন্য স্বার্থান্ধদিগের দ্বারা ব্যয়িত হয়, তখন উহাকে আমরা বিলাসিতা, সৌখীনতা, বাবুয়ানী বলিয়া থাকি।

এইস্থলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। সামাজিক রীতিনীতি এবং দেশের জল-বায়ু অনুসারে অনেক দ্রব্য বিভিন্ন দেশে নিত্য আবশ্যক অথবা বিলাস-সামগ্রী হইয়া থাকে। ইউ-রোপে জুতা এবং জামা পরিধান কোন শ্রেণীর পক্ষেই বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে উহা বিলাস হইবে।

আমাদিগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে ছাতা ব্যবহার বিলাস নহে, কিন্তু ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা বিলাস হইবে। চীনদেশে চা পান বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে ইহা বিলাস। বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন দেশের জল-বায়ু এবং সামাজিক অভ্যাস অনুসারে বিলাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। দেশের জল-বায়ু এবং সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেহ অবজ্ঞা করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ কতকগুলি কৃত্রিম অভাব মোচন করিবার জন্য শুধু ব্যস্ত হয়, অথচ ঐ সমস্ত অভাব মোচন না করিলেও বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামে তাহার শক্তির হ্রাস হয় না, তাহা হইলে ধনবিজ্ঞান অনুসারে আমরা তাহাকে বিলাসী বলিব।

বিলাস-ভোগ সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত

এক্ষণে বিলাস-ভোগ কোন ব্যক্তিবিশেষ এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা বিচার করিতে হইবে। বিলাসীরা বলিয়া থাকেন, আমরা যদি বিলাস ভোগ না করি, অধিক সংখ্যক লোক কোন কাজ না পাইয়া অনাহারে থাকিবে। অনেক লোক বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, উহাদিগের কাজ যাইলে সমাজের ক্ষতি হইবে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইবে। যে টাকা তাঁহারা বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য খরচ করিতেছেন, সেই টাকায় যদি তাহারা একটি হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে রোগীদিগের শুশ্রূষা এবং তাহাদিগের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ

প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রায় অতগুলি শ্রমজীবী কাজ পাইত। শ্রমজীবীদিগের পক্ষে ফল সমানই হইত। উপরন্তু সমাজে একটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠানের সূচনা হইত; যাহাদিগের জীবন দুর্ব্বহ এবং অন্ধকারময় তাহারা কিয়ৎপরিমাণে সুখী হইয়া সমাজের শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি করিত। এমন কি যদি ধনীরা বিলাস-ভোগে অর্থ ব্যয় না করিয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের দ্বারা উহা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবে। অনেক শ্রমজীবী এইরূপে কাজ পাইবে এবং ধনীদিগের অর্থও বৃদ্ধি পাইবে। য়্যাড্যাম স্মিথ বলিয়াছিলেন, কোন ধনী যদি কয়জন চাকর নিযুক্ত করেন তিনি গরীব হইতে থাকিবেন, কিন্তু যিনি শিল্পী নিযুক্ত করেন তিনি আরও ধনী হইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনীর নিজের অর্থবৃদ্ধি অপেক্ষা সমাজের অর্থ এবং আনন্দ বৃদ্ধি অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতে হইবে। বিলাসীরা আরও বলিয়া থাকেন, সমাজের যদি বিলাস-ভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে অভিনব অভাব-মোচনোপযোগী অভিনব দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইবে না। ইহার ফলে সমাজের ধনোৎপাদন-শক্তি হ্রাস পাইবে, কর্ম্মশক্তি ক্রমাগত একই প্রকার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইলে উহা বিকাশ লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ধনোৎপাদনের আর এক দিকও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ধনোৎপাদন সময়-সাপেক্ষ। সমাজ যদি নিত্য নূতন জিনিষ চাহে, তাহা হইলে অনেক জিনিষ যে গুলি কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই পুরাতন হইয়া যাইবে। ঐ গুলি যদি বিক্রয় না হয় তাহা

হইলে সমাজের কত পরিমাণ শক্তি যে ব্যর্থ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে বিলাস-ভোগ সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

রাস্কিন এক স্থলে লিখিয়াছেন—যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই উপযুক্ত আহার এবং বাসস্থান লাভ না করিতে পারে, ততদিন সে সমাজে বিলাস-ভোগ অতি নিষ্ঠুর কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। রাস্কিনের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে ইউরোপ-আমেরিকায় অর্থের যেরূপ অপব্যবহার হয় তাহা ধারণা করিলে বিপুল অর্থশালী পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষেও এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আমেরিকার একজন কোটিপতি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ভোজনে বসিয়া এক রাত্রে কোটি টাকাও খরচ করিয়া থাকেন। সেখানকার ধনীরা কে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ভট উপায়ে অর্থ ব্যয় করিতে পারে এই চিন্তাতেই ব্যস্ত! পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ বিপুল অর্থোপার্জ্জন, সেরূপ অর্থের অপব্যবহারও সমান ভাবে দেখা দিয়াছে। অথচ অসংখ্য শ্রমজীবী আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারে না।

আমাদের বিলাসভোগ

আমাদের দেশে আজকাল বিলাস-ভোগ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে পারিবারিক ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া যে আদর্শ (average) তালিকা গঠিত হইয়াছে তাহা হইতে দেশের

মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ বুঝা যাইবে—

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীন মধ্যবিত্ত
১। খাদ্য	৯৫'৪	৯৪'০	৮৪'৫	৭৯'০	৭৭'৭	৭৪'০
২। বসন	৪'০	৩'০	১২'০	৯'০	৯'০	৪'৭
৩। চিকিৎসা	×	১'০	১'০	৫'০	৫'৯	৮'০
৪। শিক্ষা	×	×	×	×	১'০	৩'৩
৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	'৬	২'০	২'৫	৪'০	৫'০	৮'০
৬। বিলাসের সামগ্রী	×	×	১'০	১'০	১'৪	২'০
মোট	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০

ধনী লোকদিগের ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই ; তাঁহাদিগের তালিকা সংগ্রহ করিলে তাঁহাদিগেরও বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ জানা যাইত। উল্লিখিত তালিকাটি হইতে বুঝা যায় যে কয়েক শ্রেণীর শ্রমজীবী শিক্ষার জন্য ব্যয় না করিয়াও বিলাস–সামগ্রী ক্রয় করে। মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীর জন্য ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থব্যয় বিলাস, শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয় অপেক্ষা অধিক।

সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যয় বিলাসিতা নহে

এ ব্যয়কে অনেকে অর্থের অপব্যবহার মনে করেন। আধুনিক কালে ইহার ভার যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে ইহা স্বীকার্য্য। ইউ-রোপীয় সভ্যতার সমাগমে এ দেশের চালচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকগুলি নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট হইয়াছে, কাজেই এক্ষণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সংক্ষেপে সারিতে অনেকে বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের মাপকাঠির দ্বারা আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি বিচার করা অনুচিত। আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্ম এবং সমাজানুমোদিত ; হিন্দুজাতি যে সামাজিক আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিল ঐ আদর্শের দিক হইতে ইহাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ

আমাদিগের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিপত্তি এখনও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বজাতি এবং সমাজের মর্য্যাদা এখনও লোপ পায় নাই। ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখে স্বজাতিদিগের সহানুভূতি এবং সমবেদনা এখনও শ্রদ্ধার সামগ্রী রহিয়াছে। কোন হিন্দুকে আমরা তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না। তাই হিন্দু তাহার মাথায় দারিদ্র্যের গুরুভার বহন করিয়াও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ প্রকার অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির নিকটতম বন্ধুদিগের সহিত বিলাসভোগের জন্য নহে,—ইহা আমাদিগের সামাজিক জীবনের সাধনার ফল। ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহা সমাজের বন্ধন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সমাজের সহিত হিন্দুর জীবন্ত যোগ-অনুভূতির ফল। হিন্দু জন্ম হইতেই সেবার জন্য বলিপ্রদত্ত। প্রথমে পারিবারিক জীবন, তাহার পর জাতিগত বা সামাজিক জীবন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। পরিবার জাতি বা সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজ তাহার কঠোর শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছে। হিন্দুসমাজ ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতিত্ব বিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দেয়। গাছ যেমন পৃথিবী হইতে

শিকড় ছাড়াইয়া ফল ধরিতে পারে না, সেরূপ হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিশাল সমাজ-ভূমিকে অতিক্রম করিয়া বিকাশ লাভ করে না।

পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ বিচার

আজকাল নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদিগের দেশ এক নূতন প্রকার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছে। এ ব্যক্তিত্ব পরিবার এবং সমাজবন্ধনকে অবজ্ঞা করে, এমন কি গৃহবন্ধনকেও অস্বীকার করিতে অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না। বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তি, তাহা ইহা স্বীকার করে না। সমস্ত বন্ধনকে শৃঙ্খলের মত দূরে নিক্ষেপ না করিতে পারিলে এ ব্যক্তিত্ব স্ফুর্ত্তিলাভ করে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশ তখনই সম্পূর্ণ যখন বিলাস-ভোগ উচ্ছৃঙ্খল হয়, নিজ ইচ্ছা সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের সমস্ত দাবীকেই অগ্রাহ্য করে। পাশ্চাত্য জগতে এ আদর্শ কোন দেশবিশেষের নহে। সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফলে এই আদর্শেরই পুষ্টিসাধন করিতেছে। বহিঃবাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ এবং স্বদেশে জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতার ফলে এই আদর্শই সেখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে মনুষ্যের কর্ম্মশক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, জগতে আর কোথাও এরূপ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মনুষ্য সেখানে শক্তিশালী হইলেও আপনার শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। ইহাতে সমাজে ঘোর অশান্তি এবং বিপ্লবের সূচনা দেখা গিয়াছে।

বিগত ৪ঠা মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া একটি সুন্দর বক্তৃতাতে আমেরিকার জাতীয় জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমেরিকা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, আমেরিকার ব্যবসায়ী এবং ধুরন্ধরগণের প্রতিভার নিকট সভ্যজগৎ মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু বিপুল অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে অর্থের নিকৃষ্ট ব্যবহারও আমেরিকাবাসিগণকে জগতের সমক্ষে লজ্জা দিতেছে। অর্থোপার্জ্জনের বিনিময়ে সমাজে যে সমস্ত ভয়ানক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দিকে দৃকপাতও নাই—টাকার ঝনঝনানি শব্দে অসংখ্য শ্রমজীবীর রোদনধ্বনি শুনা যায় না। আমেরিকা বড় হইয়াছে, বড় হওয়াতে তাহার দীনতা আরও প্রকাশ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজ যে ব্যক্তিত্বকে তাহার বিপুল প্রয়াসের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, উহা মানব-সভ্যতার পরিপোষক নহে বলিয়া সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই একটা নূতন যুগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই নূতন যুগে সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবে। সমাজের বাহিরে, দীনদরিদ্রদিগের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ হইতে দূরে নিঃসম্পর্ক ভাবে বাস করা তখন হেয় হইবে। সমাজ যে সকলকে লইয়া—সমাজে সকলেই সুখশান্তির জন্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী, এবং এজন্য সকলেরই পরস্পরের নিকট কর্ত্তব্য আছে,—এ জ্ঞানের তখন উপলব্ধি হইবে। ধনী বা নির্ধন, পণ্ডিত বা মূর্খ

সকলেই যে মানুষ—তাহার বোধ হইয়া মনুষ্যত্বের আর অমর্য্যাদা হইবে না। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যখন শ্রদ্ধা বাড়িবে, তখন প্রজাতন্ত্র এক নূতন প্রাণ পাইবে, সমাজের সকরুণ সহানুভূতির সুরের সহিত আপনার সুর মিলাইবে, উহার মঙ্গল সাধন করিতে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। রুসোর ঐক্যমন্ত্র, ওয়ার্ডস ওয়ার্থের উচ্চ নৈতিক আদর্শ, শেলির গভীর সমবেদনা, এবং ম্যাজিনির ধর্ম্মমূলক প্রজাতন্ত্রবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্লাইল এবং এমার্শনের মানব-পূজা, ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমাজ-তন্ত্রবাদ, জেম্‌স ও বার্গসার আধ্যাত্মিকতা এবং আধুনিক চিত্রকলার অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে সকলেরই মধ্যে একটা নূতন যুগের ভাবুকতা, এক মহা প্রাণ নবজীবনের সূচনা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য জগৎ এখন এক বিপুল আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়াছে।

আধুনিক হিন্দুসমাজে পরানুকরণ

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য,—ইউরোপ যে সময়ে আপনার সভ্যতার মূলমন্ত্র এবং আদর্শগুলি আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, আমরা এখন সে গুলিই খুব আগ্রহের সহিত আমাদের জাতীয় জীবনে অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইউরোপীয় জাতিদিগের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক উন্নতি, এবং তাহাদিগের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার করিবার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদিগের জাতীয় আদর্শ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। আমাদিগের দেশে পুরাতন এবং নূতন আদর্শের মধ্যে

তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভুত্ব এবং প্রাবল্যের নিকট আমাদের জাতীয় আদর্শগুলি হার মানিতে চলিয়াছে। ইউরোপ যখন আপনার মাপকাঠি পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে আমরা ঠিক তখনই ইউরোপীয় মাপকাটি এদেশে আনিয়া উহার দ্বারা আমাদিগের সমস্ত অনুষ্ঠান বিচার করিতেছি। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদপ্রথার প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে।

নৈতিক অবনতি

ইউরোপের সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের আদর্শ আমরা ভারতবর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি, অথচ আমাদের সমাজের পক্ষে ঐ আদর্শ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য একেবারেই নাই বলিলেও চলে। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অশান্তি কলহ আনিয়াছি, পাশ্চাত্য গৃহস্থের স্বার্থপরতা স্বার্থান্ধতা আনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা এবং কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা আমাদিগের জাতিভেদপ্রথাকে বন্ধন মনে করিয়া উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অথচ ইউরোপের ঐক্যমন্ত্র হজম করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় হইয়া সমাজের বিপুল অর্থোৎপাদনের সহায় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্য আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার আবরণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের কোন চেষ্টা হইতেছে না, অথচ পরিবারবর্গের প্রতি

কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনাস্থা হইয়াছে। স্বার্থপরতার সঙ্গে অর্থপৈশাচিকতা এবং ভোগ-বিলাস-স্পৃহা সমাজকে আক্রমণ করিতেছে। ইউরোপীয় আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আমাদের সমাজে বিলাসপ্রিয়তা এবং সমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য আনিয়া দিয়াছে।

বিলাসিতার কুফল

পূর্ব্বেই আমাদের শ্রমজীবিগণের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। মধ্যবিত্তদিগের বিলাস খাতে ব্যয় যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাও বলা হইতেছে। ইহার প্রতি এখনও সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশে এখন হিন্দুজাতির উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা যে হ্রাস পাইতেছে তাহার কারণ, সমাজে ভোগবিলাসের বৃদ্ধি এবং বৈষয়িক জীবনের অবনতি। নদীপ্রবাহের বেগ হ্রাস, বহুবৎসর চাষ, কৃষকের অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে। গ্রাম্যশিল্পগুলি কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত হইতেছে। শিল্পিগণের বংশ-পরম্পরালব্ধ কর্ম্মনৈপুণ্য ব্যর্থ হইতেছে। দেশে মধ্যবিত্তদিগের জন্য শিল্পব্যবসায় শিক্ষার বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ধুরন্ধরগণেরও আবির্ভাব হয় নাই। অপরদিকে ভোগ-বিলাসের বাসনা বাড়িয়াই চলিতেছে। পল্লীগ্রামের কুটিরেও বিলাসিতার স্রোত পৌছিয়াছে। কৃষক এবং শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কাঁসা-পিত্তলের বাসনের পরিবর্ত্তে এনামেলের বাসনের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কাঁসা-পিত্তলের বাসনগুলি এনামেলের বাসন অপেক্ষা অধিককালস্থায়ী এবং

ভাঙ্গিয়া গেলেও ঐগুলি কাঁসা-পিত্তলের দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু এনামেলের জিনিষগুলি অব্যবহার্য্য হইলে উহাদিগের পরিবর্ত্তে আর কিছু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে তৈজসপত্রগুলি দরিদ্রদিগের মূলধন বিশেষ। অবস্থা মন্দ হইলে ঐগুলি বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া দৈনিক খরচ চালান যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি কৃষকগণ দৃশ্য-মনোহর এনামেল বাসনে মুগ্ধ হইয়া দুর্দ্দিনের সহায় ঐ সমস্ত তৈজসপত্রকে ত্যাগ করিতেছে। জামা, জুতা, এবং মিহি সূতার বিলাতী কাপড় পরিধানও আরম্ভ হইয়াছে। দেশের বিদ্যালয়ের এমনি গুণ—কোন কৃষক এবং শ্রমজীবী কয়দিন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িলেই বাবু না হইয়া ফিরিতে পারে না। অনেক সময় এমনি 'চাল বিগড়াইয়া' যায় যে তাহারা বসিয়া থাকিবে, তবুও বাপ-পিতামহের কর্ম্ম করিবে না।

মূল্যাধিক্য ও মধ্যবিত্তদিগের দুরবস্থা

কিন্তু মধ্যবিত্তেরা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই চাকুরীজীবী। আফিস আদালতে তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়। কাজেই তাঁহারা বিদেশী বেশভূষা, চালচলন অবলম্বন করিতেছেন। কার্য্যোপোলক্ষে তাঁহাদিগের সহরে থাকা আবশ্যক। গ্রাম অপেক্ষা সহরে সংসারের খরচ অনেক অধিক। গ্রামে থাকিয়া অনেক গৃহস্থ মৎস্য শাক-সবজী বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন, কিন্তু সহরে আসিয়া ঐগুলি ক্রয় করিতে হয়। সহরে দ্রব্যের মূল্য খুব অধিক। নিম্নলিখিত তালিকাতে দেশের মূল্যাধিক্যের পরিমাণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

১৮৭৩ সালের মূল্যকে ১০০ বলিয়া ধরা হইয় ছ

১।	কৃষিজাত খাদ্যসামগ্রী—চাউল,	১৮৭৩	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০
	দাল যব, ভুট্টা প্রভৃতি …	১০০	১৭৬	১৮১	২২৬	১৯৩	১৫৫
২।	অন্য খাদ্য—ঘি লবণ …	১০০	৮২	৯৬	৯৪	৮১	৯০
৩।	চিনি এবং চা …	১০০	৬৮	৭৮	৪০	৭৮	৮৫
	(১—৩) খাদ্য …	১০০	১০১	১৪১	১৬৭	১৪৬	১২৭
৪।	তুলা, রেশম, পশম, এবং পাট						
	—বস্ত্রাদির উপাদান …	১০০	১২২	১২৭	১০৮	৯৬	১০৮
৫।	খনিজ পদার্থ—লোহা, তামা,						
	কয়লা … …	১০০	১১৯	১৩৪	১৩৫	১২৪	১২৩
৬।	অন্যবিধ—কেরোসিন,						
	চামড়া, ইত্যাদি …	১০০	১৩৬	১৪৩	১৩৮	১২৭	১৩১
	(৪—৬) দ্রব্য সামগ্রী …	১০০	১২৭	১৩৫	১২৬	১১৪	১২০
	(১—৬) খাদ্য এবং দ্রব্যসামগ্রী	১০০	১২৯	১৩৭	১৩৯	১২৪	১২২

আহার্য্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ২৭৲ এবং অন্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ২২৲ বাড়িয়াছে। মূল্যাধিক্যের ফলে কৃষক, মহাজন এবং ব্যবসায়িগণ লাভবান হইয়াছে। যেখানে কৃষক দরিদ্র এবং ঋণভারগ্রস্ত সেক্ষেত্রে মহাজন এবং ব্যবসায়িগণই অধিক লাভ করিয়াছে। কৃষকদিগের লভ্য তাহারাই আত্মসাৎ করিয়াছে। শিল্পীদিগের অবস্থা মন্দ হইতেছে। শিল্পজাত দ্রব্যের উপাদান-সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে, কিন্তু শিল্পীরা তাহাদিগের নির্ম্মিত দ্রব্যও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। কলকারখানার প্রতিযোগিতায় তাহারা উপরন্তু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। চাকুরীজীবিদিগের মাহিয়ানা বাড়িবার আশা নাই। বরং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই উহা কমিতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অথবা অন্যপ্রকার স্বাধীন অন্নসংস্থানের দিকে বেশী মন দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার-বৃদ্ধির সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের আফিস-আদালতে বা ব্যবসায়িদিগের আফিসে কেরাণীগিরি পাওয়া কঠিন হইয়াছে; উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়িগণের গড় আয় বিশেষ কমিয়াছে। অপরদিকে দেশের মূল্যাধিক্যের সমস্ত ভারই মধ্যবিত্তদিগের উপর পড়িয়াছে, কারণ মূল্যাধিক্যের সহিত তাহাদিগের আয়-বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধই নাই। পূর্ব্বেই তাহাদিগের সহরে অবস্থান পূর্ব্বক বিদেশী চালচলনের অবলম্বনের কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অধিকমূল্য বিদেশী বেশভূষা পরিধান, চা-পান, সিগার-সিগারেট ধূমসেবন,

বরফ-পান প্রভৃতির সঙ্গে সহরে অবস্থানের অন্যবিধ আনুসঙ্গিক ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাতায়াতে সময় সংক্ষেপ উদ্দেশ্যে নহে, অনেক সময়ে আরাম উপভোগের জন্য কেরাণীরা ট্রামের টিকিট ক্রয় করিতেছে। সহরে স্বাস্থ্যরক্ষা, জলের কল, জল-সরবরাহ এবং আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের জন্য মিউনিসিপালিটি সমুদয়ের খরচ খুব অধিক হইয়াছে, অনেক সহরেই মিউনিসিপাল ট্যাক্সের পরিমাণ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর সহরের বাড়ী-ভাড়াও বাড়িয়াই চলিতেছে। উপরন্তু সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া চাকুরীজীবিগণ বিশ্রামলাভের জন্য উৎকট আনন্দ-উপভোগের পক্ষপাতী হইতেছে। উহাতে তাহাদিগের কেবলমাত্র যে অধিক ব্যয় হইতেছে তাহা নহে, নৈতিক অবস্থারও অবনতি হইতেছে। এই সমস্ত কারণে মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

উচ্চ জাতি সমূহের ক্রমিক সংখ্যা হ্রাস

মধ্যবিত্তদিগের ব্যয় বাড়িতেছে অথচ অন্ন-সংস্থানের সুবিধা হইতেছে না, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে আধুনিক চালচলন রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বৈষয়িক অবস্থার যদি ক্রমোন্নতি না হয় তাহা হইলে সমাজে হয় লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে, না হয় সমাজানুমোদিত চালচলন রক্ষিত হইবে না। অধিকাংশ স্থলেই চালচলন রক্ষা করিবার জন্য সমাজের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়, লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে

বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা কঠোর হওয়াতে এই দুই দেশে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাত অধিক কম। এ জন্য এই দুই দেশের সমাজ-বিজ্ঞান-বিদ্গণ বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। আমাদের দেশে উচ্চজাতিসমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে তাহার প্রধান কারণ একই—আমাদের দারিদ্র্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চালচলন উচ্চ হইয়াছে, অনেক নূতন কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ঐ চালচলন রক্ষা, ঐ সমস্ত নূতন নূতন অভাব মোচন করিবার জন্য দেশে নূতন নূতন বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নাই। আমাদের বৈষয়িক জীবন-প্রবাহ প্রবলতর না হইয়া বরং বৎসর পর বৎসর ক্ষীণ হইতেছে। কাজেই সমাজ তাহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া চালচলন রক্ষা করিবার জন্য অধিক ব্যস্ত হইয়াছে।

লোকসংখ্যা হ্রাসের প্রতিকার,—
ধনবৃদ্ধি বনাম সমাজ-সংস্কার

লোকসংখ্যা হ্রাসের অন্য কারণও থাকিতে পারে। কিন্তু বৈষয়িক জীবনের ক্রমাবনতি যে ইহার প্রধান কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দেশের কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানবিদ্ একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথাকে লোক-সংখ্যা হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এই সবগুলির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সমাজবিজ্ঞানের দিক হইতে ইহাদিগের উপকারিতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন

আধুনিক কালে ঐগুলি আমাদের বৈষয়িক জীবন-যাপনের সহায় না হইয়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথা যে এখন আমাদের বৈষয়িক জীবন-প্রবাহের বাধাবিঘ্নরূপে পরিণত হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ প্রকার বাধাবিঘ্ন নদী-প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী প্রতিরোধ-স্বরূপ। নদীর গতি নদীমধ্যবর্ত্তী বাধাবিঘ্ন অপেক্ষা মূল প্রস্রবণের উপর অধিক নির্ভর করে। আমাদের দেশে বৈষয়িক জীবন-প্রবাহ যে ক্ষীণ হইয়াছে তাহার কারণ উহার মূল প্রস্রবণ নানা কারণে শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। সমাজের ধনোৎপাদনশক্তি হ্রাস পাওয়াতে দেশে কঠোর দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে ধনোৎপাদনের মূল তথ্যগুলি আলোচনা না করিয়া যদি আমরা যৌথপরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় শক্তির অসদ্ব্যবহার হইবে। সামাজিক বিপ্লবের সূচনা না করিয়া এখন দেশের ধনোৎপাদনশক্তি কিরূপে বৃদ্ধি পায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য সমস্ত চিন্তা নিয়োগ করিতে হইবে। দলাদলি এবং বিবাদের প্রশ্রয় দিবার অবসর আমাদের সমাজের নাই; এখন স্থিরভাবে সংযতভাবে সমাজের সকলকে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। ধনবৃদ্ধির জন্য সমাজের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারিলে, সমাজ তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হইবে। কঠোর দারিদ্র্য-ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের পর সামাজিক অনুষ্ঠান-গুলি নূতন প্রাণ পাইবে, আপনাদিগের ক্রমবিকাশ ফলে তাহারা

নূতন অবস্থার উপযোগী হইবে, তর্কবিতর্ক বাক্‌বিতণ্ডা দলাদলির তখন কোন প্রয়োজন হইবে না। সমাজের যাহা গোড়ায় গলদ, সেই কঠিন দারিদ্র্য-ব্যাধির প্রতিকার হইলে, সমাজ শরীরের ব্যাধির কোন উপসর্গই আর দেখা যাইবে না, তখন সমাজ সবল হইয়া শান্তিলাভ এবং আনন্দ উপভোগ করিবে।

ধনবৃদ্ধির উপায়—বিলাসবর্জ্জন

ধনবিজ্ঞান-বিদেরা বলিয়াছেন, ধনাগমের প্রধান উপায় মূলধন বৃদ্ধি। ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অন্নবস্ত্রাদির অভাব মোচন করিয়া যদি বিলাস-সামগ্রীতে তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত ধন ব্যয় না করেন ; পরন্তু উদ্বৃত্ত ধন শিল্পবাণিজ্য-ব্যবসা ইত্যাদিতে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি অতি শীঘ্রই হইবে।

ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিলাস-বর্জ্জন এবং কৃষি ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যোগদান এবং উদ্বৃত্ত ধন-নিয়োগ জাতীয় ধনবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। আধুনিক কালে আমাদের দেশে কোন্ শিল্প এবং ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক,—ফ্যাক্টরী, ছোট কারখানা অথবা গৃহ-শিল্প ইহাদিগের মধ্যে কোন্ অর্থোৎপাদনপ্রণালী বিভিন্নক্ষেত্রে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা আমাদের মধ্যবিত্তেরা কি পরিমাণ লাভ করিতে পারে, এ সমস্ত বিষয়ের শীঘ্রই মীমাংসা না করিলে বৈষয়িক জীবনে উন্নতির আশা করা বৃথা। এই অধ্যায়ে উক্ত জটিল বিষয়গুলি আলোচনা করা হইবে না।

কিন্তু ধনোৎপাদনের আর একটি দিক,—ধনী এবং মধ্যবিত্তদিগের বিলাসবর্জ্জন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বে সমাজের দিক হইতে বিলাসবর্জ্জনের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। যে সমাজে অনেক লোক অন্নবস্ত্রাভাব মোচন করিতে অসমর্থ সেখানে বিলাস-ভোগ নিশ্চয়ই সমাজ-নিন্দিত এবং নীতি-বিরুদ্ধ। ধনোৎপাদনের দিক হইতে দেখিতে গেলেও বিলাসবর্জ্জনের উপকারিতা বেশ বুঝা যাইবে। ধনোৎপাদন-ক্রিয়ায় সমাজের অনেক শক্তি ব্যয় হয়। এই শক্তিব্যয়ের ফলে সমাজ তাহার নানাবিধ অভাব মোচন করিতে পারে। শারীরিক অভাবগুলি মোচন করিয়া সমাজ যদি ক্রমাগত নূতন নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহা হইলে শেষে সমাজ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও তাহারই চিন্তাপ্রসূত অভাবগুলি মোচন করিতে সমর্থ হইবে না। বিলাসিতার সৌখীনতার সীমা নাই, কিন্তু সমাজের শক্তির সীমা আছে। সুতরাং ব্যক্তির মত সমাজেরও তাহার নির্দ্দিষ্ট শক্তির যথোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বিলাসভোগে শক্তির অপব্যয় করিলে সমাজ ক্রমে দুর্ব্বল হয়। আবার সামাজিক জীবন শুধু বর্ত্তমান লইয়াই নহে, ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত আপদ-বিপদের জন্য সমাজের শক্তি সঞ্চয় করা উচিত। যে সমাজ কেবল-মাত্র বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত, যে সমাজের সমস্ত ধন এক পুরুষেই আমোদ আহ্লাদ বিলাস উপভোগের জন্য ব্যয়িত হয়, সে সমাজ অপরিণামদর্শী, ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনে তাহার বিপদের সীমা থাকে না। সম্রাট নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ, ওয়েলিংটনের বীরত্ব নহে

ইংলণ্ডের ধনী এবং ব্যবসায়িগণের মিতব্যয়িতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথমে ইংলণ্ডে তাহার পর সমগ্র ইউরোপীয় জগতে এক বিরাট বৈষয়িক আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। উহার ফলে ইংলণ্ড ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইয়াছিল। ইংলণ্ড বিলাসভোগে অর্থ ব্যয় না করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। নেপোলিয়নের সহিত যখন ইউরোপের যুদ্ধ বাধিল তখন ইংলণ্ডই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতা হইল, ইংলণ্ডের অর্থ এবং সৈন্য-সাহায্যে স্পেন, জর্ম্মাণী এবং অষ্ট্রীয়া মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শেষে নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সেণ্টহেলেনা দ্বীপে যখন নেপোলিয়ন তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন ফরাসীদের দারিদ্র্যের সীমা ছিল না। ফ্রান্স অপেক্ষা ইংলণ্ড যুদ্ধের গুরু ব্যয়-ভার সহজে বহন করিতে পারিয়াছিল।

ভোগে অশান্তি

কেবলমাত্র যুদ্ধ বা বহিঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষা এবং শান্তি স্থাপনের জন্য নহে, সামাজিক জীবনে আনন্দ-ভোগের জন্যও বিলাস-দমন আবশ্যক।

যে সমাজ বিলাস-ভোগে উন্মত্ত, তাহা শীঘ্রই কতকগুলি কৃত্রিম ব্যবধানের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। সমাজের দরিদ্র সম্প্রদায়ের সমস্ত শক্তি তাহাদিগের প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিবার জন্যই ব্যয়িত হয়। ধনীসম্প্রদায় কৃত্রিম অভাব মোচন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে। মানুষের কৃত্রিম অভাবের সংখ্যা

স্বাভাবিক অভাব অপেক্ষা অধিক। কৃত্রিম অভাব সমূহের বৈচিত্র্যেরও সীমা নাই, কিন্তু প্রাথমিক অভাব সমূহের ঐরূপ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। বিলাস-সামগ্রীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের সীমা নাই বলিয়া একদিকে যেমন দরিদ্রসম্প্রদায় অন্নবস্ত্রাভাব পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে,—অপরদিকে ধনীদিগের মধ্যে কে কত প্রকার বিলাস-সামগ্রী ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়। ক্রমশঃ ধনিগণের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর বিভিন্ন চালচলন নির্দ্দিষ্ট হয়। অবশেষে ধনী এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে ব্যবধান খুব অধিক হয়। ক্রমে অর্থের এবং বিলাসভোগের তারতম্যের সহিত সামাজিক ব্যবধান দেখা যায়। এইরূপে বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক জাতি নীচ জাতির সহিত বিবাহে আদান প্রদান করে না। অর্থের তারতম্যের উপর নির্ভর করিয়া জাতিভেদপ্রথা একবার সৃষ্ট হইলে, সমগ্র সমাজ অর্থলালসার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। অর্থোপার্জ্জন সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারের উপায় হইলে সমাজের আর কোন লক্ষ্য থাকে না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে। ইহার ফলে জাতির যাহা চরম আদর্শ হওয়া উচিত, সেই আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্য হইতে সমাজ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। উপরন্তু সমাজে ঘোর অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অহোরাত্র খাটিয়া মরে, অথচ তাহারা কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারে কি না সন্দেহ। অনৈক্য খুব

অধিক হইলে সমাজে বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইবেই। পাশ্চাত্য জগৎ এখন ঠিক এই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজে অশান্তি

পাশ্চাত্য জগতে ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এ কারণে ধনী এবং দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য আর এক দিকে বিলাস-ভোগের লীলাখেলা, ইহাই পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক জীবনের চিত্র। অর্থের তারতম্য অনুসারে পাশ্চাত্য সমাজ বিশিষ্ট জাতি-সমূহে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থপূজার বিপুল সমারোহের মধ্যে ধর্ম্ম, প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ধর্ম্ম এখন ধর্ম্মের ভাণ মাত্র হইয়াছে। ধর্ম্মের যাহা প্রাণ—ভাবুকতা পাশ্চাত্য সমাজের আব্ হাওয়াতে পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। ধর্ম্ম অভাবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর নাই, এমন কি গৃহবন্ধনের শৈথিল্যও দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অসংযম, রাষ্ট্রীয় জীবন এখন দলাদলির ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে, দলাদলি ভুলিয়া সমগ্র সমাজের যাহা প্রকৃত অভাব তাহা চিন্তা করিবার কাহারও অবসর নাই। ইহার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপত্তিও দেখা দিতেছে।

ইউরোপে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনকুবের-গণই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত আইনকানুন নিয়ন্ত্রিত করিতে-

ছেন। সমাজের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সাহিত্য জগতে মহনীয় ভাব ও সত্য আর আবিষ্কৃত হইতেছে না। যে বিদ্যা অর্থকরী নহে তাহার সম্মান কমিয়া আসিতেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে,—জীবিকার্জ্জনোপযোগী কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞান বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করণের জন্য নিয়োজিত হইতেছে,—সমাজের বিশ্রাম-ভোগ যাহাতে সহজসাধ্য হয় এবং বিশ্রাম লাভ করিয়া সমাজ যাহাতে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার দিকে দৃকপাত নাই। বিজ্ঞানের সহিত চিত্রকলাও এখন বিলাস উপভোগের সহায় হইয়াছে, মধ্যযুগে সমাজের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত তাৎকালিক চিত্রকলার যে জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

প্রতিযোগিতা ও অনৈক্য

বিলাস-ভোগের সহিত সমাজে সহানুভূতির অভাব দেখা দিয়াছে। ডারুইন প্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন—সমাজ কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়াই উন্নতি লাভ করিতে পারে। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন, প্রতিযোগিতার ফল সক্ষমের জয় এবং অক্ষমের পরাজয়, সক্ষমেরাই সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এই মতই পাশ্চাত্য জগতে সাধারণতঃ গ্রাহ্য। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, সমাজের মধ্যে যে কত লোক জীবন-

সংগ্রামে পরাজিত হইয়া দুঃখ এবং কষ্টের সহিত কালাতিপাত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু তাঁহাদের মতে এই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, অসমর্থদিগের বিলোপই সমাজের কল্যাণপ্রদ, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে সমাজশক্তির অপব্যবহার হইবে। কিন্তু বিবর্ত্তনবাদের এই মূল তথ্যটি সমাজ-বিজ্ঞানের শেষ কথা নহে। কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারাই সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না, প্রতিযোগিতার সহিত সহযোগিতাও সমাজের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সমাজ প্রতিযোগিতাকেই এখন সভ্যতাবিকাশের মূলমন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে,—সহযোগিতা সামাজিক উন্নতির কিরূপ সহায়, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অনৈক্যকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগৎ স্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ

কিন্তু এই অনৈক্যের সহিত যে বিলাস-ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সমবেদনার অভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিতেছেন। তাহা অনৈক্য অস্বীকার করে, তাহা ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত—ইহার নাম সোসিয়ালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ। তাঁহারা বলেন, অনৈক্য নহে, ঐক্যই স্বাভাবিক,—পাশ্চাত্য সমাজে শতকরা ৮০ জন এখন যে দেশোৎপন্ন ধনসম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগও ভোগ করিতে

পারিতেছে না, তাহার কারণ তাহাদিগের কর্ম্ম বা বুদ্ধিশক্তির অভাব নহে। তাহার কারণ ধনীরা শ্রমজীবিগণকে তাহাদিগের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে কৃত্রিম অবৈধ উপায়ে শ্রমজীবিগণকে দরিদ্র করা হইয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা ধনীদিগকে বিচার করিবার ভার নিজেদের হাতেই লইয়াছেন। ধনীরা বিলাস-উপভোগে উন্মত্ত, তাহাদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যদি তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ট্যাক্স করিয়া ধীরে ধীরে দেশের ধনসম্পত্তি ধনীদিগের নিকট হইতে দরিদ্রদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত সম্পত্তি এবং মূলধন সমাজের হস্তগত না হয়, ততদিন তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে। শেষে সমাজ দেশের সমগ্র ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রত্যেকের অভাবানুযায়ী ধন বিতরণ করিবে। বিলাসিতা চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। অথচ কর্ম্মশক্তিও হ্রাস পাইবে না। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ তখন আরও ঘনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রত্যেকে আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া সমাজের প্রতি আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। অলস হইয়া সমাজের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য লইতে সকলেই লজ্জিত বোধ করিবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের ইহাই আশা। মানুষ তখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে,—সমাজে প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য থাকিবে না, ভ্রাতৃপ্রেমে এবং সহ-কারিতা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া দিবে।

সমাজ-তন্ত্রবাদের অলীকতা

সামাজিক জীবনে ঘোর অশান্তির ফলে এই উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি। সমাজে অনৈক্য না থাকিলে এক বৈচিত্র্যহীন সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিবে, ইহাতে সমাজ অচিরেই প্রাণহীন এবং অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে। ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। অধিকন্তু মনুষ্য যতদিন দেবত্বপ্রাপ্ত না হয় ততদিন সমাজতন্ত্রবাদীদের আশা কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য যাহাতে সমাজের মঙ্গলবিধানে প্রযুক্ত হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

হিন্দুসমাজে ঐক্য ও অনৈক্যের সমন্বয়

আমাদের পুরাতন সমাজ বিভিন্ন আশ্রম এবং অধিকারভেদ সৃষ্টি করিয়া একদিকে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং অপর দিকে গোষ্ঠীর প্রভাবকে প্রবল রাখিয়াছিল। ইহার ফলে সমাজ ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া উহার সহিত গোষ্ঠী-জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিল। একদিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অপরদিকে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধান, হিন্দুসমাজের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাজের এ আদর্শ এখন লুপ্তপ্রায়। মুসলমান-বিজয়ের পর হিন্দু-সমাজের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে হিন্দুসমাজের আদর্শগুলি পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। এই কারণেই হিন্দুর জাতি, কুল এবং ধর্ম্ম ক্রমশঃ ব্যক্তিগত হইতেছে, সমাজে গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাব লোপ পাইতেছে। বিশাল সামাজিকত্বের আদর্শ

ত্যাগ করিয়া হিন্দু এখন বাহ্য আচার-ব্যবহার এবং কার্য্যকলাপের বিশিষ্টতা সৃষ্টি করিয়া সমতাস্থাপন এবং গোষ্ঠীর প্রভাব রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহাতে পদে পদে হিন্দু অকৃতকার্য্য হইতেছে। আধুনিক কালে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম দিনে দিনে যতই কঠোর হইতেছে, ততই আচারমূলক সামাজিক ব্যবস্থা হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার এখন হিন্দুজাতির মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে পারিতেছে না, আধুনিক হিন্দু সমাজবন্ধনকে অগ্রাহ্য করিতেছে. সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এখন পুষ্টি লাভ করিতেছে। হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশ এখন ঠিক বিপরীত দিকে হইতেছে। হিন্দুসমাজ অহিন্দু হইতে চলিয়াছে।

হিন্দুসমাজের বাণী

কিন্তু এককালে হিন্দুসমাজই সাম্য ও বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের বৈষয়িক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধর্ম্ম-জীবনে শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। হিন্দুসমাজ প্রতি-যোগিতা রাখিয়াও স্বৈরাচার ও অসংযমের শাস্তি বিধান করিয়াছিল, অধিকার-ভেদ মানিয়াও স্বার্থপরতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ অনৈক্যকে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রেম এবং ভাবুকতার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব, সমতা ও প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। আধুনিক ধনবিজ্ঞান-বিদ্‌গণ বিলাসবিষজর্জ্জরিত পাশ্চাত্য জগতে ঐক্যমূলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের ঘোর অশান্তি দূর করিবেন বলিয়া যে

আশার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পাগলের পাগলামি। অনৈক্যকে না মানিয়া সমাজ গঠন করা অসম্ভব। অনৈক্য মানিতেই হইবে, অথচ অনৈক্য যাহাতে অত্যাচার ও নির্য্যাতনে পরিণত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এই কথা পাশ্চাত্যজগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজ এই কথাই পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করিবে। এ কথা প্রচারিত না হইলে পাশ্চাত্য জগতের দুঃখ এবং অশান্তির অবসান হইবে না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই,—বিলাস অর্চ্চনার নিষ্ফল আয়োজনের ভারে প্রপীড়িত পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃস্থল হইতে দীনতার করুণ ক্রন্দন বিশ্বদেবতার চরণে পৌঁছিয়াছে। তাই বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র নূতন জীবনের প্রয়োজন চলিতেছে। হিন্দুসমাজ ঐক্য ও অনৈক্য, সাম্য ও বৈষম্য, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন করিয়া এক নূতন জীবনের অমৃত-মন্দাকিনী-ধারা ধাতার কমণ্ডলু হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিবে। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সেই ভবিষ্যৎ সার্থকতার আশায় রহিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্নসংস্থান

স্বাধীন জীবিকা জাতীয় উন্নতির সহায়

কর্ম্ম করিতে করিতেই মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অধিকন্তু ঐ কর্ম্মের জন্য যদি সে পরনির্ভর না হয়, কার্য্যে যদি তাহার স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে তাহার শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখা যয়ে। প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার জীবন ধারণের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বিনা পরিশ্রমে এ জগতে জীবিকার্জ্জন অসম্ভব। জীবিকা-অর্জ্জনের উপায়কে আমরা বৃত্তি বলিয়া থাকি। যাহাদের পরাধীন বৃত্তি, তাহারা কর্ম্মক্ষম হইতে শিখে না, কারণ কার্য্যের ফল হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া তাহাদের অধিক পরিশ্রম করিবার উৎসাহ থাকে না। বাস্তবিক যে বৃত্তি যত অধিক পরিমাণে স্বাধীন, তাহাতে কর্ম্মশক্তির তত অধিক উদ্রেক হয় বলিয়াই অর্থাগমের তত সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

ইহা আমাদের অতি প্রচলিত কথা। যাহাদের ভিক্ষাবৃত্তি, তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কাজেই

লক্ষ্মী তাহাদিগকে কৃপা করেন না। ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা রাজসেবা অথবা চাকুরীতে মানুষ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। ভিক্ষাবৃত্তিতে সে সম্পূর্ণ পরনির্ভর. কিন্তু চাকুরীজীবী হইলে সে তাহার পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফললাভ না করিলেও কিছু ফল পাইয়া থাকে। কৃষিকার্য্য, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই মনুষ্যের কর্ম্মশক্তির আমরা চরম বিকাশ দেখিতে পাই। যে এই সকল ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিবে, সে সেই পরিমাণ লাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হয় না। উপরন্তু স্বাবলম্বন হেতু কতকগুলি নৈতিক গুণও বিশেষ পরিস্ফুট হয়। চিন্তার স্বাধীনতা সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশেষ কল্যাণপ্রদ। স্বাধীন জীবিকা চিন্তার স্বাধীনতার পরিপোষক। বাস্তবিক স্বাধীন অন্ন-সংস্থান একদিকে যেরূপ কর্ম্মশক্তি বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়, অপর-দিকে মনুষ্যের চিন্তাস্রোতকে বিভিন্নমুখে প্রবাহিত করাইয়া উহাকে স্বচ্ছ এবং প্রবল করিয়া তুলে। কোন নির্দ্দিষ্ট খাতে যদি চিন্তাস্রোত ক্রমাগতই প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে উহা অচিরেই আবিল পঙ্কিল হইয়া উঠে। এইরূপে পরাধীন জীবিকা চিরকালই কর্ম্ম ও চিন্তা-বিকাশের প্রধান অন্তরায়। জীবিকা-অর্জ্জনে যে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে, সেখানে নিত্য নূতন অর্থাগমের উপায় এবং অর্থোৎপাদন-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সে সমাজ অতি সহজেই তাহার অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়। চিন্তাজগতেও সেখানে নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার হইয়া থাকে,—সমাজের সকল দিকেই উন্নতি হয়।

"স্বদেশী" আন্দোলন ও স্বাধীন-জীবিকা

আমরা চাকুরীজীবী ; কিন্তু চাকুরীজীবী হইলেও আমাদের দেশে স্বাধীন অন্নসংস্থানের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। চারি দিকেই শিল্প এবং ব্যবসায়-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। দেশের নানা স্থানে বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদেশ-প্রেরণ-পরিষৎ স্থাপিত হইতেছে। রাজা মহারাজ জমিদারেরাও বিদেশে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন। বহু ছাত্র অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশের কারখানায় শিল্পবিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা করিতেছে। বহু ছাত্র ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, অনেকে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ব্যবসায়ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। ১৯০৫ সাল হইতে এই কয় বৎসরের মধ্যে যে কতগুলি কারখানা প্রতিষ্ঠীত হইয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু দেশে যে বিপুল ব্যবসায়-আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহার হঠাৎ প্রতিরোধ দেখা গিয়াছে। অনেকগুলি ব্যবসায়ই "ফেল" করিয়াছে, ব্যবসায়-জগতে আবার অবসাদ দেখা গিয়াছে। বিদেশীয় পণ্যে আমাদের বাজার আবার ভরিয়া গিয়াছে। দেশে কয়েক বৎসর সুবাতাস বহিয়াছিল, এখন বাতাস বিপরীত দিকে বহিতেছে। ব্যবসায় জগতে আমাদের এই আকস্মিক উত্থান এবং পতনের কারণ কি ? এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

"স্বদেশী"র অবনতির কারণ

আমাদের বৈষয়িক জীবনের এই কয় বৎসরের ইতিহাস স্থির

ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা আমাদের দোষ দেখিতে পাইব। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিদেশের যে কোন কারখানায় যে কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিলেই—যে কোন ব্যক্তি এ দেশে অতি সহজেই কলকারখানা চালাইতে পারিবে। দেশে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, কোন ব্যবসায় অতি সহজেই বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও লাভজনক হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি নাই। দেশের প্রকৃত অভাবের দিকে মনোযোগ না দিয়া আমরা কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। উপরন্তু বিদেশে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অত্যধিক পরিমাণে ছিল। বিদেশের কারখানায় দুই এক বৎসর শিক্ষানবিশরূপে থাকিয়া যে কোন ব্যক্তি এখানে কারখানা স্থাপন করিয়া অতি সহজেই এখানকার বাজার হস্তগত করিবে. ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বিদেশ হইতে একজন যে কোন শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইবার জন্য আমরা তথনই বহু অর্থব্যয়ে বিরাট কলকারখানার আয়োজন করিয়া ফেলিলাম। আমরা যদি তাহাকে কয়েক বৎসর দেশের বিভিন্নস্থানে শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্রে ভ্রমণ করিবার সুযোগ প্রদান করিতাম, বিভিন্ন বাজারের দালাল পাইকার এবং শ্রমজীবিগণের সহিত পরিচয় লাভের অবসর দিতাম, তাহা হইলে আমাদের অনেক অর্থব্যয় সার্থক হইত। দেশের কোন্ স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে যাতায়াতের সুবিধাহেতু দ্রব্যবিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে, দেশীয় শিল্পী শ্রমজীবীর শক্তি এবং কর্ম্মকুশলতা ব্যবহার করিবার

সুযোগ পাওয়া যাইবে, দ্রব্য প্রস্তুতকরণের উপাদান সামগ্রী অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করা যাইবে,—এ সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল না। কোন স্থানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে সে স্থানের সুবিধা অসুবিধাগুলি বিশদভাবে দেশে আলোচিত হয় নাই। এ জন্য কারখানা স্থাপন করিবার পর দ্রব্যোৎপাদন এবং দ্রব্য বিক্রয়ের অসুবিধা বোধ হওয়াতে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থের অযথা অপব্যয় হইয়াছে। তাহার পর আমাদের আর একটি দোষ হইয়াছে, আমরা অবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। আমাদের মূলধনের পরিমাণ অল্প, আমাদের শিল্পীদের বংশপরম্পরালব্ধ শিল্পনৈপুণ্য থাকিলেও আমরা তাহাদিগকে কারখানার কার্য্যে না লাগাইয়া অপটু শ্রমজীবিগণকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, অথচ আমরা আশা করি বিলাতের বড় বড় কারখানার মত অতি সুন্দর মনোরম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিব। দৃশ্যমনোহর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা অপেক্ষা সাধারণ ব্যবহৃত সুলভ দ্রব্য প্রস্তুত করা সহজ। লৌহ ইস্পাতের কারখানা স্থাপন না করিয়া ছুরি, কাঁচী, কব্জা, পেরেক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কারখানা, বড় বড় কাঁচের কারখানা না করিয়া ভাঙ্গা কাচের জিনিষ হইতে বোতল চুড়ী প্রভৃতির কারখানা, কাগজের পরিবর্ত্তে কার্ডবোর্ড প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করিলে ফেল হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু আমরা আশার বশবর্ত্তী হইয়া সহজসাধ্য কাজ ছাড়িয়া কঠিন কাজে হাত দিয়াছি, সুতরাং আমাদের পরিণামে ঠকিতে হইয়াছে,—

'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিববামনঃ'।

অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক

আপাততঃ বড় বড় কারখানা খুলিবার জন্য প্রভূত অর্থ এবং শ্রমজীবীশক্তি ব্যয় না করিয়া যাহাতে অল্প মূলধনে স্বাধীন জীবিকার উপায় হয় আমাদের তাহা দেখা এখন আবশ্যক।

(ক) বাণিজ্য

আমাদের আধুনিক অবস্থায় দালাল বণিক প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করা শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য এবং আশু ফলপ্রসূ হইবে। বাংলাদেশে প্রায় ৩০ কোটী টাকার পাট ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, ইহাতে বাঙালী যে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহা অতীব দুঃখের বিষয়। পাট ক্রয় বিক্রয় করিয়া বিদেশী দালাল বণিকগণ বৎসর বৎসর ৩০ লক্ষেরও অধিক টাকা লাভ করিয়া থাকে। বিদেশী বণিকগণ আমাদের দেশে আসিয়া আমাদেরই কৃষকগণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন শস্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধনী হইতেছে। আর আমরা এক মুঠা অন্নের জন্য চাকুরী খুঁজিতেছি। বণিক-বৃত্তিতে ব্যবসায় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও বেশ চলে, কোন বিশিষ্ট ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবহারিক বিদ্যার আবশ্যকতা নাই। অর্থ ব্যয় করিয়া আমেরিকা ও জর্ম্মাণীর শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন নাই। এ দেশেরই প্রধান প্রধান হাট বাজারে ভ্রমণ করিয়া ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। অধিক মূলধনেরও আবশ্যকতা নাই। অল্প টাকায় আরম্ভ করিয়া ব্যবসায় খুব বাড়িয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বড় বড় কারখানা খুলিয়া

দ্রব্যোৎপাদন করা অপেক্ষা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া আমাদের দেশে আধুনিক কালে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে।

(খ) এবং ক্ষুদ্র কারখানার উপযোগিতা

কেবল বাণিজ্য নহে, বড় বড় কারখানায় দ্রব্যোৎপাদন অপেক্ষা আধুনিককালে ছোট ব্যবসায়ই আমাদের অধিক উপযোগী এবং লাভজনক। কলিকাতার বড় বড় পাটের কল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশ কারখানাই ক্ষুদ্র আয়োজনে পরিচালিত হয় এবং অনেকগুলি বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত ও লাভজনক হইয়াছে। ক্ষুদ্র কারখানাগুলির মধ্যে ৩৬৭টী কারখানা ভারতবাসী, ১৭৯টী ইংরাজ, ৪টী ইংরাজ ও ভারতবাসী, এবং ৭টী চীনা কর্তৃক পরিচালিত। ব্যবসায়ের অনেক বিভাগেই ভারতবাসীর কেবল প্রাধান্য নহে, প্রভুত্ব রহিয়াছে। দড়ি, কাঠ, টাইপ, লৌহ, পিতল, তেল, সাবান, ময়দা, চিনি, ছাতা, সুরকী প্রভৃতির কারখানার প্রায় সবগুলিই ভারতবাসীরই হস্তগত। ছাপাখানা, কেমিকেলওয়ার্কস, পাটপ্রেস, প্রভৃতি আমাদেরই একচেটিয়া। বাস্তবিক আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ধীরে ধীরে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছে, তাহা আমরা এতদিন চিন্তা করি নাই। এই বৎসরের কলিকাতার লোক গণনায় এ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় মোট ১০৫টী যৌথ কারবার এবং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহাদের মধ্যে কেবল ৭টী কোম্পানীর মধ্যে ভারতবাসী ডিরেক্টর আছে।

বাকী সবগুলিরই সাহেব ডিরেক্টর। সুতরাং যৌথ কারবার দেশে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই, ইহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত কারবারের মধ্যে ৩৬০ কারখানা ভারতবাসী এবং ৮৫ ইংরাজেরা পরিচালনা করিতেছে।

দেশে শিল্প ব্যবসায়ের আন্দোলনের প্রারম্ভে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক এবং অধিক ফলপ্রদ। প্রথমতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্রে আপাততঃ অল্প মূলধন পরিমাণে পাওয়া যাইবে, সুতরাং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিতে যৌথভাবে মূলধন-সংগ্রহের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীর দ্বারা ব্যবসায় চালিত হইলে দায়িত্ব-বোধ লঘু হয়, একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় যেরূপ শৃঙ্খলা এবং সুবন্দোবস্ত দেখা যায়, কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ে আমাদের দেশে সেরূপ দেখা যায় নাই। সুতরাং যতদিন আমাদের ব্যবসায়িগণ আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিক্ষা না করিবে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়-প্রচলনই শ্রেয়স্কর। কলিকাতার ক্ষুদ্র কারখানাগুলি ব্যক্তিগত দায়িত্ব-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐগুলি বিশেষ লাভজনক হইয়াছে। ব্যবসায়ের আনুমানিক ব্যয় অধিক হয় না, বন্দোবস্তও সুচারু হওয়াতে লাভ হইয়া থাকে। এরূপে মধ্যবিত্ত লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আপনাদের অল্প মূলধন নিয়োজিত করিয়া ধনী হয়।

মধ্যবিত্তদিগের ধনবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ। ধনীদের বিলাসিতা সৌখীনতা আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তদিগের স্বোপা-

র্জ্জিত অর্থের অপব্যয় হয় না। উপরন্তু মধ্যবিত্তদিগের ভাবুকতা আছে, তাহারা সমগ্র সমাজের অভাব আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে অধিক সক্ষম, সুতরাং সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য তাহারা অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে পাবে। বাস্তবিক আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীন ব্যবসায় ক্ষেত্রে আরও অধিক পরিমাণে অর্থ নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিলে, সমগ্র সমাজে চিন্তা এবং কর্ম্মের স্বাধীনতা দেখা যাইবে ; এবং দেশে এমন একটা চিন্তার আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইবে যাহা আমরা এখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। মধ্যবিত্তেরাই চিরকালই সমাজের নেতা। জীবিকার্জ্জনে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে, সমাজের চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তির পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কলিকাতার ব্যবসায়জগতে মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র কারখানাগুলি পরিচালনা করিতেছে, তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণ	৬১
কায়স্থ	৬৫
তিলী	২৮
সদ্গোপ	২৮
কলু	২০
বৈদ্য	১৬
চাষীকৈবর্ত্ত	১২
সুবর্ণবণিক	১০

মাড়োয়ারীদের মধ্যে ১৯টি এবং সেথদিগের মধ্যে ১২টি কারখানার স্বত্বাধিকারী বর্ত্তমান। কলিকাতায় যেভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণী কারখানা প্রভৃতির সত্বাধিকারী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, সেরূপ দেশের সর্ব্বত্রই বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় শিল্প-পদ্ধতি—কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্র কারখানা

আমাদের দেশে এখন সাধারণতঃ দুই প্রকার শিল্পপদ্ধতি দেখিতে পাই—(ক) কুটীর শিল্প এবং (খ) কারখানা। কুটীর-শিল্পে শিল্পী সাধারণতঃ আপনার পরিবারবর্গের সাহায্যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। যেখানে শিল্পী কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মজুরী দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লয়, আমরা তাহাকে কারখানা বলিয়া থাকি। কুটীর-শিল্পকে আমরা পারিবারিক শিল্প বলিতে পারি, কিন্তু কারখানায় শিল্পীরা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কুটীর-শিল্পে শিল্পী আপনার মূলধন যোগাইয়া থাকে। কারখানায় ওস্তাদ অথবা মিস্ত্রী শিল্পের সমস্ত মূলধন দেয়, শিল্পীরা তাহার মজুর মাত্র। আমাদের দেশে প্রত্যেক সহরেই আমরা কারখানা দেখিতে পাই। বিশেষতঃ যে সমস্ত শিল্পে মূলধন অধিক পরিমাণে আবশ্যক, যেখানে বহুমূল্য যন্ত্রপাতী ক্রয় করিতে হয়, অথবা দ্রব্যের কাটতি খুব কম হয়, বড়লোকের পছন্দের উপরই যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কার-

থানাই দৃষ্টিগোচর হয়। শিল্পীদের মধ্যে একজন ধনী হইয়া কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শিল্পিগণকে আপনার কারখানায় নিযুক্ত করে। সোণা, রূপা, কাঁসা, উৎকৃষ্ট কাঠ এবং হাতীর দাঁতের কাজ সহরের কারখানাতেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার কাঁসারীপাড়া, চিৎপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানার কাজ বিখ্যাত।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিচালনা

আধুনিক কারখানার ওস্তাদ অথবা বড় মিস্ত্রী দ্রব্যপ্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতী ক্রয় করিয়া থাকে এবং দ্রব্যসমূহের বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি শিল্পশিক্ষার আয়োজন হয়, তাহা হইলে কারখানা-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। বাজারে কি প্রকার দ্রব্যের কাট্‌তি হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিক জ্ঞান থাকে, সুতরাং দ্রব্যবিক্রয়ের অধিক সুবিধা হইবে, নূতন যন্ত্র এবং প্রক্রিয়া প্রভৃতিও অতি সহজেই প্রচলিত হইবে। বাস্তবিক বিভিন্ন সহরে যেখানে দ্রব্যের অধিক কাট্‌তি আছে, সেখানকার কারখানাগুলি যদি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি বিভিন্ন শিল্পের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া তাহাদের মূলধন নিযুক্ত করে এবং শিল্পি-গণের বিদ্যাচাতুরী নিয়োগ করে, তাহা হইলে কেবল শিল্পসমূহের যে উন্নতি হয় তাহা নহে, তাহাদের নিজেদেরও স্বাধীন অন্ন-সংস্থানেরও উপায় হইয়া থাকে। কারখানাশিল্পগুলি মধ্যবিত্তদের

হস্তগত হইলে যেরূপ সমাজের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা, কুটীরশিল্প-গুলিতেও তাহাদের প্রভাব বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

কলের সহিত হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা—ব্যবসায়-জগতের কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী

আমাদের দেশে পল্লীগ্রামসমূহে কুটিরশিল্পগুলি যে একবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। দ্রব্যোৎপাদনে কলের শক্তি অধিক স্থলে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে শিল্পীকে কলকারখানার নিকট হার মানিতে হইবে তাহা নহে। যে ক্ষেত্রে একই প্রকার দ্রব্য অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে, সেখানে মনুষ্য-শক্তি তড়িৎ অথবা ষ্টীম-এঞ্জিনের শক্তির নিকট হার মানিবে। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, সেখানে শিল্পীর কর্ম্মকুশলতাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। দ্রব্য ক্রয়-ব্যাপারে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি প্রকটিত হয়, সে ক্ষেত্রে দ্রব্যোৎপাদনে শিল্পীর বিদ্যা ও চাতুরী কলের শক্তি অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইবে। বাস্তবিক আমাদের দেশে যতদিন রুচির বৈচিত্র্য আছে, ততদিন শিল্পীর ব্যবসা কখনও মন্দা হইবেনা। উপরন্তু পল্লীগ্রামে মূলধন খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় এবং কাটৃতি অধিক হয় না; সুতরাং ক্ষুদ্র

ব্যবসায়ই সেখানে লাভজনক হয়। অল্প মূলধন বৎসরে তিন চারিবার ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসিলে গড়ে লাভ অধিক হয়। বহুল পরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, যে পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেই পরিমাণই বাজারে কাটে।

পাশ্চাত্য ব্যবসায়-জগৎ হইতে ইহার উদাহরণ

বাস্তবিক এই সকল কারণে ইউরোপেও কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় এখনও বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস ইউরোপ বড় বড় কারখানা ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াই বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বড় বড় কারখানার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্ষম হইয়াও এখনও যে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা অনেকের ধারণা নাই। জর্ম্মাণীতে ১৪'৩ ক্রোর শ্রমজীবিদের মধ্যে ৫'৪ ক্রোর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। ইংলণ্ডে বড় বড় কারখানা, যেখানে ১০০০এর অধিক লোক কাজ করে, সেখানকার শ্রমজীবিদের সংখ্যা, ছোট ব্যবসায়ে যে সকল লোক কাজ করে, তাহাদের সংখ্যার সমান। ইতালী, বেলজিয়াম, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি দেশে কুটিরশিল্প এখনও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং বড় কারখানা বা ফ্যাক্টরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদ্র ব্যবসায় অথবা কুটিরশিল্প যে সমূলে বিনষ্ট হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবন হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যজগতে একদিকে কল-

কারখানার যেরূপ বিরাট আয়োজন, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পব্যবসায়েরও সেরূপ বিপুল বিস্তৃতি।

কুটিরশিল্পের উন্নতিসাধন-প্রণালী—
(ক) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতী ও প্রক্রিয়া-অবলম্বন

আধুনিক কালে কুটির শিল্পসমূহ যে কারখানার প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইবে, পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু নানা উপায়ে কুটিরশিল্পগুলির উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা সুকঠিন। পাশ্চাত্য জগৎ অনেক উপায়ে কুটিরশিল্পগুলির উন্নতি সাধন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নূতন নূতন যন্ত্রপাতী ও প্রক্রিয়ার প্রচলন প্রভৃতি কারণে শিল্পগুলি নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক সোম্বার্ট বলিয়াছেন যে, ১৯০৭ সালের লোকগণনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জার্ম্মাণীতে পুরাতন গৃহ-শিল্পসমূহের মধ্যে যে গুলি নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিতেছে না, সে গুলির ক্রমাবনতি হইতেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনেক গৃহ-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ব্যতীত আর এক উপায়ে পাশ্চাত্য জগতের গৃহ-শিল্পগুলি নবজীবন লাভ করিয়াছে,—তাহার নাম সমবায়।

(খ) শিল্পে সমবায়-পদ্ধতি-প্রচলন

রাইফেজেন কৃষিকার্য্যে সমবায় প্রচলন করিয়া পাশ্চাত্য কৃষক-সমাজে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। হারস্থুল্জ্ ডেলিট্জ্ শিল্পী এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে যৌথকারবার প্রচলন করিয়া শিল্পিগণের মধ্যে সেইরূপ আর একটি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। শিল্পিগণের মধ্যে সমবায়ের উদ্দেশ্য মোটামুটি এই,—শিল্পিগণ মূলধন-অভাবে পাইকার অথবা ধনীর নিকট দ্রব্য-প্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী লইতে বাধ্য হয়। অবশেষে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাইকার অথবা ধনীকে উহা প্রদান করে এবং তাহাদের নিকট মজুরী পাইয়া থাকে। অনেক সময়ে ধনী ও পাইকার শিল্পীকে অত্যল্প মজুরী দিয়া লভ্যের অধিকাংশই আত্মসাৎ করে। শিল্পিগণের মূলধন নাই বলিয়াই তাহাদের দারিদ্র্যের সীমা থাকে না। এ স্থলে যদি কয়েকজন শিল্পী সমবেত হইয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং ঐ মূলধনে উপকরণ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং অবশেষে নিজেরাই দ্রব্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা হইলে দ্রব্যোৎপাদনের ন্যায্য লাভ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে পারে না। ইহাকেই শিল্পে সমবায়-পদ্ধতি বলা হয়। শিল্পে সমবায় এদেশে নূতন নহে। আমাদের সমাজে অনেক স্থলেই সমবেতভাবে শিল্প-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কাশীর বিখ্যাত বারাণসী সাড়ী প্রভৃতি সমবেত প্রণালীতেই প্রস্তুত হয়। তন্তুবায়গণ সম্মিলিত হইয়া রেশম ইত্যাদি ক্রয় করে এবং বস্ত্র বয়ন করিয়া

অবশেষে তাহাদিগেরই নিযুক্ত পাইকার দ্বারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। কাশীর মদনপুরা পল্লীতে যাইয়া অনেকে ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পশ্চিম অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির মধ্যে অনেক সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেগুলিরও বিশেষ উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে।

শিল্প-প্রচারকের আবশ্যকতা—তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী।

পল্লীগ্রামের অসংখ্য শিল্পী এবং শ্রমজীবিগণকে যদি কঠোর দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই এই সমবায়-পদ্ধতির প্রচলন আবশ্যক। সমবায়-পদ্ধতি যাহাতে দেশময় প্রচলিত হয় তাহার জন্য প্রচার আবশ্যক। মধ্যবিত্তদিগকেই এই প্রচার-কার্য্য করিতে হইবে। উপরন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর পক্ষে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের সহায় হইবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন স্থানে, শিক্ষাপ্রচারক, স্বাস্থ্যপ্রচারক দেখা দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের দুঃখ দৈন্য ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্ননি-সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শিক্ষাপ্রচারক এবং স্বাস্থ্য-প্রচারকের মত পরহিতব্রত শিল্প ও ব্যবসায় প্রচারকও এখন দেশে আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যেখানে শিল্পীরা তাহাদের বিরল কুটীরে বসিয়া সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, সেখানে যাইয়া তাহাদিগের নিকট আশার কথা প্রচারিত করিতে হইবে। জগতের বিভিন্ন স্থানে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেখানকার

শিল্পিগণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে ; জার্ম্মাণী, ইতালী, হল্যাণ্ড এবং জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্প-জগতের বিচিত্র খবর আমাদের শিল্পিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। আমাদের শিল্পিগণকে জানাইতে হইবে যে তাহাদেরই মত কুটীরে বসিয়া এই সমস্ত দেশের শিল্পিগণ নানাবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে এবং নূতন নূতন প্রক্রিয়া দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-ব্যবহার এবং প্রক্রিয়া-প্রচলন যাহাতে সহজসাধ্য হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঋণ-ভারে জর্জ্জরিত শিল্পিগণের নিকট সমবায়-পদ্ধতির উপকারিতা বুঝাইয়া তাহাদের ভগ্নহৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার করিতে হইবে। সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম্, ইতালী, প্রভৃতি দেশের শিল্পিগণ তাহাদের অবস্থার কি বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া যৌথ যন্ত্র-ক্রয়-সমিতি এবং দ্রব্য-ভাণ্ডারের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় শিল্পশিক্ষার এই বিপুল আন্দোলনের নেতা হইবেন। শিল্পপ্রচার কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নূতন নূতন স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় আবিষ্কার করিবেন। এই উপায়ে একই সঙ্গে শিল্পপ্রচার এবং স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবনতির কারণ—
আমাদের চিত্তসম্মোহন

দেশে শিল্পপ্রচার এবং স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উদ্যোগ হইবার

পূর্ব্বে আমাদের বৈষয়িক জীবনে আত্মশক্তির অনুভূতি হওয়া আবশ্যক। আমাদের সমাজে সাহিত্য, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতির ভিতর দিয়া চিত্তসম্মোহন এবং পরানুকরণের কুফল মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমাদের চিত্তসম্মোহন সর্ব্বাধিক পরিমাণেই দেখা গিয়াছে। এ কারণে ধর্ম্ম সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনেকটা নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে; এই চিত্তসম্মোহন যতদিন না সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি একবারেই অসম্ভব। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এখনও ধারণা আছে, যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতবাসী শিল্পবাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া কৃষিজীবী হইয়া সুখী হইবে, শিল্পব্যবসায় প্রতিষ্ঠা এ দেশে অসম্ভব; কারণ তাঁহারা উদাহরণ দিয়া বলেন লোহাকে গড়িয়া পিটিয়া কখনও কেহ সোণা করিতে পারিবে না। সুতরাং শিল্পব্যবসায়-প্রবর্ত্তনের জন্য সমস্ত চেষ্টা-উদ্যোগ যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ; প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব হেতু যে আমাদের দেশে শিল্পব্যবসায় কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় না। ইতিহাস বলে যে, আমাদের শিল্পিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য জগতে রোম এবং পূর্ব্ব জগতে চীন, জাপান এবং ভারতীয় সাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল। ভারতবর্ষ কেবল কৃষির জন্য যে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, তাহার শিল্পজাত সামগ্রী পৃথিবীর

অন্য সমস্ত দেশ প্রভূত অর্থ দিয়া ক্রয় করিত। এমন কি এক সময়ে রোম নগরীর বিপুল অর্থ ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হেতু নিঃশেষ হইয়া যাইবার আশঙ্কা হইয়াছিল বলিয়া প্লিনি প্রমুখ রোমীয় স্বদেশসেবকগণ ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন পাশ করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকল বিষয়েই ভারতবাসীরা উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়াই ভারতবর্ষে তদানীন্তন কালে সভ্যজগতের সমস্ত অর্থ আসিয়া সঞ্চিত হইত। সুতরাং আমাদের দেশে শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা প্রকৃতির বিরুদ্ধ আয়োজন এবং আমাদিগকে চিরকালই বিদেশী পণ্যের দ্বারা নিত্য অভাব মোচন করিতে হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। এ কথা আমাদের চিত্ত সম্মোহনের একটি উদাহরণ মাত্র।

আজকাল অনেকেই এ ধারণার ভুল বেশ বুঝিয়াছেন এবং দেশময় শিল্প-ব্যবসায়ের বিপুল আয়োজনে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, তাঁহারাও যে চিত্তসম্মোহনের ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাহাও নহে। বিদেশের ফ্যাক্টরী কল-কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের কুটীর-শিল্পগুলিকে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া তাঁহারা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, এ দেশের কুটীরশিল্পগুলি একেবারেই সেকেলে, আধুনিক বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামের পক্ষে অসম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুতরাং তাঁহারা বলেন এগুলি রক্ষা করিতে গেলে জাতীয় শক্তির অপব্যয় হইবে। কুটীরশিল্পগুলির বিনাশ একেবারে অবশ্যম্ভাবী মনে

করিয়া তাঁহারা সকল প্রকার দ্রব্যোৎপাদনের জন্য কারখানা-প্রতিষ্ঠা আমাদের বৈষয়িক উন্নতির একমাত্র সোপান মনে করেন। পাশ্চাত্যজগৎ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃথিবীর সমস্ত হাট-বাজার করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অতএব আমাদিগকেও কল-কারখানার বিপুল আয়োজন করিতে হইবে, নচেৎ আমাদিগের রক্ষা নাই—এই ধারণার মূল আমাদের পরানুকরণের প্রবৃত্তি।

অনুচাকির্ষা ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্প-পদ্ধতির লোপসাধন

বহু বৎসরের ধীর ক্রমবিকাশের ফলে পাশ্চাত্যজগতের বৈষয়িক জীবন বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়া আধুনিক কালে কল কারখানা-গুলিকে দ্রব্যোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, আমরা মনে করিতেছি আমরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার দুই একটা বুলী শিখিয়াই উহার ভিতর দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবল শক্তির প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহারও ভাগ লইতে সমর্থ হইয়াছি। বড়লোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমরা তাহার মনুষ্যত্বটুকুও পাইলাম মনে করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি। জাতীয় শক্তি যে জাতীয় সাধনার ফল তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু তাহা নহে, আমাদের চিত্তসম্মোহন এতদূর হইয়াছে, পাশ্চাত্যজগতের সাধনা সফল হইয়াছে কি না তাহার দিকে আমাদের দৃকপাত নাই। পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি সেখানকার সমাজে যে চির অশান্তি কলহ আনিয়া দিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। ধনী-

দিগের সহিত শ্রমজীবি-সমাজের সংঘর্ষ পাশ্চাত্যজগতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে তাহা আমরা মোহান্ধ হইয়া দেখিতে পাই না। চিত্তসম্মোহনের ফলে আমরা বিদেশীয় অনুষ্ঠানগুলির গুণ ভিন্ন দোষ দেখি না এবং স্বকীয় বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলিকে অবজ্ঞা অবিচার করিতেছি। আমাদের পারিবারিক শিল্পগুলি আমাদের শিল্পিগণের কিরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহায় হইয়াছে এবং গৃহকেই জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্র করিয়া দৈনন্দিন কর্ম্মকে কিরূপ সুন্দর ও শান্তিদায়ক করিয়া তুলিয়াছে তাহা না ভাবিয়া আমরা ইহাদের বিনাশসাধনের পথ মুক্ত করিয়া দিতেছি। আমাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শগুলি আমাদের শিল্পকলাতে পরিস্ফুট হইয়া বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনে প্রেম ও ভাবুকতা আনিয়া দিয়াছে, ইহা অনুভব না করিয়া আমরা দৃশ্য-মনোহর বিদেশী পণ্যের লোভে দেশীয় শিল্পকলাকে বিসর্জ্জন দিতেছি। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া ব্যক্তিজীবনের সহিত সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজে কিরূপ শান্তি সদ্ভাবের স্রোত প্রবাহিত করাইয়াছে, এবং সামাজিক জীবনে দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যেও একটা সহজ সরল ত্যাগের সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা জন্মের মত ভুলিতে বসিয়াছি। দেশীয় বিচিত্র বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি যতদিন নবজীবন লাভ করিয়া নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া বিকাশলাভ না করে, ততদিন আমাদের বৈষয়িক উন্নতি অসম্ভব। বৈষয়িক জীবনে আমরা যতদিন আত্মশক্তির মর্য্যাদা অনুভব না

করিব ততদিনই আমরা আপাদের পারিবারিক শিল্পকলা ব্যবসায় প্রভৃতি নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠন করিতে পারিব না।

জাতীয় শিল্পের আদর্শের ক্রমবিকাশ

অনুচীকির্ষা বলবতী থাকিলে, আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইতে হয়। এজন্ত আমরা স্বকীয় বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি পশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংস্পর্শে যে নূতনভাবে নবযুগের উপযোগী হইয়া পুর্ণর্গঠিত হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সমাজের চিন্তা ও কর্ম্ম এ কারণে এ বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হয় নাই। এক্ষণে আমাদিগকে পরানুকরণের পরিবর্ত্তে আত্মশক্তির মর্য্যাদা প্রচার করিতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ কি এবং তাহার সার্থকতা কোথায়, সমগ্র সমাজের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সমাজকে ধীরে ধীরে অনুকরণের প্রবলস্রোত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহা কি আমরা এখনও বুঝি নাই যে, পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি এ দেশে আনয়ন করিতে গেলে দেশের সামাজিক শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, আধ্যাত্মিকতা একেবারেই লোপ পাইবার সম্ভাবনা আছে? আদর্শের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে এগুলিকে অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার পরিচয় মাত্র। আমরা কি এত দিনেও অনুভব করিতে পারি নাই যে, পরানুকরণ করিয়া কোন জাতি বড় হইতে পাবে না, জাতীয় জীবন কখনই পরানুকরণ হইতে শক্তিলাভ করে না? ভগবান

প্রত্যেক জাতিরই এক একটি ক্রমবিকাশের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ পথ বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত অনুকরণ করিতে পারিলে সে জাতি তাহার চরম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোঃ বত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥

জাতীয় সাধনা একমুখী হইয়া একাগ্রতার সহিত রথচক্রাঙ্কিত নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। জগতের নিয়মই এই—প্রত্যেক জাতি আপনার সেই নির্দ্দিষ্ট পথে ক্রম-বিকাশ লাভ করিয়া বিশ্বের সভ্যতা-মন্দিরের এক একটি গুপ্ত দ্বার খুলিয়া দেয়। বিবিধ রত্নরাজি-মণ্ডিত বিশ্ববিধাতার বেদীতে উপনীত হইবার যে কেবল একটিমাত্র পথ আছে, তাহা নহে; এবং মণিময় বেদীর উপর বিশ্বসভ্যতার যে একই রূপ তাহাও নহে; বেদীর উপর বিশ্ব দেবতা লক্ষ মূর্ত্তিতে,—লক্ষ অবতার, লক্ষ মহাবিদ্যার মূর্ত্তিতে দেখা দেন। যে যে পথ দিয়া আসিবে, সে সাধনশেষে এক নূতন দ্বার খুলিবে, নূতন মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইবে,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহম্"। ভগবানের ইহাই অমোঘ বাণী।

অতীতকালে আমাদের জাতীয় জীবনের নিকট বিশ্বদেবতা এক স্বতন্ত্র অপরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন, আমাদের সামগান-মুখরিত তপোবনে, শিল্প-ভাস্কর্য্য-কারুকার্য্যখচিত দেবমন্দির গুহাগহ্বরে, ধর্ম্মরাজাধ্যুষিত বিচারমণ্ডপে, ধর্ম্মপ্রচারকবাহী সামুদ্রিক পোতে

সে মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া জাতীয় আকাঙ্খার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। বিশ্বদেবতার সেই মূর্ত্তির প্রতি বিমুখ হইয়া তাঁহার অন্যমূর্ত্তি চাহিলে তিনি আমাদিগকে কখনই কৃপাচক্ষে দেখিবেন না। ভিন্ন-পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অন্য মন্দিরে খুঁজিতে যাইলে আমরা নিশ্চয়ই বিফল হইব। তিনি ত তাঁহাকে পাইবার পথ আমাদিগকে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে সেই পথে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ হইয়া বিপুল প্রয়াস এবং কঠোর অভ্যাসের সহিত একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে। যতই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব, ততই আমাদের জাতীয় জীবনদেবতার সনাতনী মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এখনকার সমস্ত দ্বিধা-আশঙ্ক তখন দূর হইবে। এখন চাই শুধু কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর ভবিষ্যতের সার্থকতায় অটল বিশ্বাস।

পঞ্চম অধ্যায়

শিল্প ও ব্যবসা-প্রচার

শিল্প-প্রণালী

আধুনিক কালে ভারতবর্ষে অর্থোৎপাদন প্রণালীর বিভিন্ন আদর্শ লইয়া একটা তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। শত শত যুগের ক্রমাবকাশের ফলে ভারতের সমাজ যে ভাবে যে পদ্ধতিতে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আজ পাশ্চাত্য জীবনযাপন ও অর্থোৎপাদন পদ্ধতির সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত। এই উভয়ের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থ্যক্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে একদিকে যেমন কতিপয় ধনী বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া বিলাস সাগরে মগ্ন রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি সহস্র সহস্র দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট শ্রমজীবিগণ অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য অপর দিকে বিলাসিতার নির্লজ্জ বিকাশ—এই বৈষম্য সেখানকার সমাজে একটা চির অশান্তি ও কলহের সূচনা করিয়াছে।

কিন্তু ভারতীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব জাতিভেদ ও একান্নপরিবার প্রভৃতি ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ-শরীরে সমানভাবে

অর্থপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দিতেছে, পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব ও সহানুভূতি জাগাইয়া দিতেছে এবং সমাজে একটা অবিচলিত শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতেছে।

পাশ্চাত্য সমাজ-জীবন ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বিকাশ এক্ষণে সমগ্র সমাজের অনিষ্টপ্রদ ও সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা এক্ষণে উচ্ছৃঙ্খলতাতে পরিণত হইয়া সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের সমাজ যে পাশ্চাত্য জীবনযাপন প্রণালীকে প্রতিরোধ করিতেছে তাহা বিচিত্র নহে। আজকাল এমন কি ইউরোপেরই ধনবিজ্ঞানবিৎ ও সমাজবিজ্ঞানবিৎ মনস্বী পণ্ডিতগণ ইহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই তাঁহাদের নিজ সমাজের অনুষ্ঠান সমূহের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন তখন ভারতের কি সেই অনুষ্ঠানগুলির পুনরাবৃত্তি করা কর্ত্তব্য? পাশ্চাত্য সমাজের বিষবৃক্ষগুলি ভারতের সমাজে রোপণ করা কি উচিত? ভারত কি পাশ্চাত্য দেশের অর্থোৎপাদন প্রণালী অনুকরণ করিতে যাইয়া তাহার সমাজে ধর্ম্মঘট, শ্রমজীবি-দলন প্রভৃতি সমাজিক সঙ্কটগুলি আনয়ন করিবে? ভারতের বৈষয়িক জীবনে এখনও সাম্যনীতির প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, ভারত কি তাহার সমাজের সনাতন ঐক্য, প্রেম এবং সহানুভূতি ধ্বংস করিবার জন্য পাশ্চাত্য অনুষ্ঠানগুলিকে অন্ধ এবং মূঢ়ভাবে অনুকরণ করিবে? ভারত কি তাহার বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের পরিণামভূত আর্থিক ও বৈষয়িক

জীবনের নিজস্ব প্রণালী ও পদ্ধতিগুলি আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে না ?

বৈষয়িক জীবনস্রোত যাহাতে প্রবল হয় এখন ভারতের ইহাই সমস্যা। আমাদের অর্থোপাদনের প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির কিরূপে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে, এ প্রশ্নের শীঘ্রই মিমাংসা করা উচিত। দেশের পল্লীগ্রামগুলি আজ পরিত্যক্ত ও বিগতশ্রী,—গ্রাম্যকৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর শোভা ও সৌন্দর্য্য হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের জাতীয় শিল্পগুলি বিনষ্ট হইয়াছে। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য আমরা পরনির্ভর হইয়াছি। বিদেশীয় দ্রব্যসম্ভার প্রচুর পরিমাণে আমাদের হাটবাজারে আমদানী হইতেছে। বৈষয়িক জীবনে আমরা কতদূর পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি তাহা আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য সমূহের তালিকা ও মূল্যাঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বৈষয়িক জীবনে "সংরক্ষণনীতি" অবলম্বন।

যদি প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্যের তালিকার প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি—দেখিতে পাইব এগুলির আমদানী আধুনিককালে অত্যাবশ্যক হইলেও একেবারে যে ইহার প্রতিরোধ করা যায় না তাহা নহে। এই দ্রব্যগুলির মূল উপাদান আমাদের দেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উপাদানগুলি বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। আবার কারখানায় সুন্দর সুন্দর জিনিষে পরিণত হইয়া এ দেশেই ফিরিয়া আসে। এই প্রণালীতে দ্বিবিধ উপায়ে দেশের ক্ষতি হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ বিদেশীয় মহাজন ও শ্রমজীবিগণ ব্যবসায়ের লাভ ও পারিশ্রমিক পায়; এদেশের কলকারখানায় ঐ দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত হইলে দেশের শ্রমজীবীগণের অন্নকষ্ট দূর হইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় জাহাজে আমদানী হয় বলিয়া আমাদিগকে মাশুল দিতে হয়। এদেশে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত হইলে মাশুল লাগিত না, দ্রব্যের মূল্য কম হইত। আমাদের প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে খুব কৃপাচক্ষে দেখেন। অথচ আমরা বৈষয়িক জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য প্রকৃতির অযাচিত দানসমূহ গ্রহণ করিতে অক্ষম। আমরা প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উপযুক্ত ব্যবহার করি না। আমাদের সাধারণ কারিগর ও শিল্পিগণ কুটীরে বসিয়া সামান্য মূলধন ও অল্পসংখ্যক যন্ত্রাদি লইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ব্যবসায়িগণ প্রভূত মূলধন লইয়া সুবিশাল যন্ত্রাদি ও বাষ্পীয় বা তড়িৎ শক্তির সাঁহায্যে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইরূপে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি আমাদের বিপনীসমূহ আয়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের মত আমাদেরও যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে ইহা আমাদের দেশে সর্ব্ববাদীসম্মত। বিদেশ হইতে আমদানী না হইয়া যাহাতে ভারতীয় কল কারখানায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং উপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে এবং এইজন্য যাহাতে প্রচুর মূলধন সংগৃহীত হইতে পারে তাহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ নাই। কেলমাত্র মূলধন সংগ্রহ নহে, দেশবাসীর ব্যবসায়বুদ্ধি বিকাশের আবশ্যকতাও আমরা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার একটা প্রবল আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে, দেশের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, এবং উপযুক্ত যুবকদিগকে নানা প্রকার ব্যবহারিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিবার জন্য বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিল্পশালায় বা কলকারখানায় শিক্ষানবিশরূপে প্রেরণ করা হইতেছে এই সমস্ত ছাত্র যাহাতে দেশে দ্রব্যাগমন শীঘ্রই কারখানা চালাইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে মূলধন প্রদান করা হইতেছে এবং তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কলকারখানাগুলি যাহাতে পাশ্চাত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তজ্জন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় "সংরক্ষণ-নীতির" পক্ষপাতী।

এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্য মোটামুটি এই.—আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্য আপাততঃ অপরিণত ও অপরিপক্ব ব্যবসায়-বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট "সংরক্ষণ নীতি" অবলম্বন করিয়া যদি বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি না করেন অথবা জনসাধারণ স্বদেশী উৎপন্ন দ্রব্য মন্দ হইলেও অধিক মূল্যে ক্রয় না করে, তাহা হইলে দেশীয় শিল্পোন্নতি একবারেই অসম্ভব। সংরক্ষণ এবং স্বদেশী, দুই অস্ত্রকেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি অথবা উভয়ে মিলিয়া আমাদের কার্য্য সাধন করিবে।

ভারতের সনাতন "কুটীর-শিল্প"

ভারতে শিল্পপ্রচারের জন্য একটা আকাঙ্খা জাগিয়াছে সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন্ শিল্প এ দেশে প্রবর্ত্তিত ও

সংরক্ষিত হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কেহই স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত করেন নাই। যে সমস্ত ইউরোপীয় শিল্প ও কল-কারখানা এতদিন আমাদের বাজার দখল করিয়াছে, দেশে সেরূপ দু' একটা কল প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ শিল্পগুলি আমাদের দেশের উপযোগী কি না, এদেশে তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে কি না কুটীর-শিল্পের সহিত ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিরূপ হইবে, এ সম্বন্ধে আমরা কোন বিবেচনা করি না। আমরা অনেক সময়ে মনে করি, আমাদের কুটীর-শিল্প মধ্যযুগেরই ব্যবস্থা বিশেষ, আধুনিক যুগে তাহার প্রচলন অসম্ভব এবং ভবিষ্যতেও ইহার কোন স্থান নাই। আজ হউক অথবা কালই হউক, কল কারখানাই ইহার স্থানগুলি অধিকার করিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; অতএব কুটীর-শিল্পের বিলোপ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন ইউরোপীয় শিল্পের পরিবর্ত্তে ভারতের কল কারখানা ও শিল্প যাহাতে সেই স্থান অধিকার করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা কি শ্রেয়স্কর নহে?

এখন এই কথাটা আমাদিগকে গভীর ভাবে ভাবিতে হইবে। ভারতে ভবিষ্যৎ যুগে কুটীর-শিল্প কোন্ স্থান অধিকার করিবে, আধুনিক কল কারখানা ইহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে কি না, এবং যদি অধিকার করে উহা বাঞ্ছনীয় হইবে কি না, এই সমস্ত প্রশ্নের শীঘ্রই মীমাংসা করিতে হইবে। আমাদের শিল্প জীবনে এমন কি অবস্থা বা চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম যাহাতে মনে করিতে পারি ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য কল-কারখানা অত্যাবশ্যক

ও অপরিহার্য্য ? দেশের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে এখন যে সমস্ত কুটীর-শিল্প বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় কি প্রত্যেক কলকারখানাই আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে ? দেশীয় কুটির শিল্পগুলির কি কোন প্রকার উন্নতিসাধনের উপায় নাই ?

আধুনিক ব্যবসায়ে কল-কারখানা ও শিল্প

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এমন অনেক অবস্থা আছে যেখানে কেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবসায়ের হিসাবে এই কেন্দ্রী-করণের সুবিধা এত বেশী যে অনেকস্থলেই হস্ত-চালিত গৃহশিল্প কল কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় কিছুতেই বাঁচিতে পারে না। যেখানে সুবিশাল যন্ত্রাদি এবং বহু লোকের পরিশ্রম ভিন্ন, দ্রব্য-প্রস্তুতকরণ অসম্ভব, সেখানে কেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। খনি সম্বন্ধীয়, লৌহ ইস্পাত সম্বন্ধীয় এবং জাহাজ ও নৌশিল্পবিষয়ক কারখানাগুলি এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় কখনই টিকিয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু অবস্থাবিশেষে ক্ষুদ্র শিল্পও অপরিহার্য্য, বিপুল কল-কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় অনায়াসেই তাহাকে হারাইয়া দেয়। একই প্রকারের বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে কল কারখানার প্রচলন অপরিহার্য্য। একই আকার ও আয়তন এবং একই বর্ণের কোন দ্রব্য বহু পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে যন্ত্রের শক্তি যে হস্তচালিত শক্তিকে পরাভূত করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত প্রভৃতি স্বাভাবিক

দৈহিক অভাবগুলি সকলেরই সমান ;—এই সমস্ত অভাব মোচনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের গুণগত পার্থক্য নিতান্ত অল্প। এই প্রকার দ্রব্যোৎপাদনে কল-কারখানার নিকট শিল্পীকে হার মানিতে হয়। একজনের নিত্য প্রয়োজনীয় দৈহিক অভাবগুলির সহিত আর একজনের অভাবের বিশেষ পার্থক্য নাই ; কিন্তু বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-রসাত্মক, মানসিক অভাব সৃষ্ট হইতে থাকে। এই শ্রেণীর অভাব বৃদ্ধির জন্য একের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্টরূপে অপর হইতে পৃথক হইয়া যায়। এইরূপে মানুষের অভাবসমূহ যখন নীচ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর হয়, মানুষের মানসিক অভাব যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখনই মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে, তখনই ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ বিশেষ অভাবগুলি মোচন করিবার জন্য হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। একমাত্র শিল্পকলাই এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে সক্ষম। খুব উন্নত সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে তাহার সাধারণ দৈহিক অভাবগুলি প্রায়ই এক রকমের, বিশেষ প্রভেদ কিছুই নাই, সুতরাং কল কারখানাজাত দ্রব্যের দ্বারা এই অভাব পূরণ হইতে পারে। কিন্তু মানসিক অভাব পূরণ বিষয়ে শিল্পকলার চিরকালই প্রাধান্য থাকিবে।

আমাদের কয়েকটি শিল্প ও ব্যবসায়

ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির উন্নতির বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে তুলা ও পাট,

কয়লা ও স্বর্ণখনি এবং কেরোসিন তৈলের কলকারখানায় ভারতে বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে। ১৯০১ সালে ১৯৭টি তুলার কল ছিল এবং তাহাতে উনিশ কোটি টাকা মূলধন খাটিত। ১৯০৮ সালে ২৩২ কারখানা এবং ৩৯ কোটি মূলধন হইয়াছে। পাটের কলের সংখ্যাও ১৯০১ হইতে ১৯০৮ সালের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩৬ হইতে ৫২টিতে পরিণত হইয়াছে এবং মূলধনও ৪·৩ কোটি হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৬·৭৫ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। কয়লার ব্যবসায় অসাধারণরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে, সমস্ত ভারতে ১৯০১ সালে খনি হইতে উত্তোলিত দ্রব্যসমষ্টি ৬·৬ লক্ষ ছিল কিন্তু ১৯০৮ সালে তৎস্থলে ১২·৭৬ লক্ষ হইয়াছে। কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়ও দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিয়াছে, ১৯০১ সালে খনি হইতে নিষ্কাষিত ৫০ লক্ষ গ্যালন স্থলে ১৯০৮ সালে ১৭৬·৬ লক্ষ গ্যালন হইয়াছে।

আমাদের আরও কয়েকটি কারখানা আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি এক রকম চলিতেছে—আর কতকগুলি মৃতপ্রায়। আমরা চিনি, তৈল, কাগজ, পশম ও রেশমের কারখানায় খুব অল্পই অগ্রসর হইতে পারিয়াছি; কাচ, চর্ম্ম, ছত্র, কলম ইত্যাদি এবং ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের কলকারখানায় কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ভারতে খনিজ ব্যবসায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে সংবদ্ধ ছিল। আজ তাহা ইউরোপীয় বৃহদাকারে প্রতিষ্ঠিত এবং সুবিধাজনক রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে পরিচালিত কল-

কারখানার সংঘর্ষে বিলুপ্ত। আমাদের খনিজ ও ধাতব পদার্থ-সমূহের কারখানায় ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। তাতার লোহ কারখানা ধাতু নির্ম্মাণ ও খনিজ ব্যবসায়ে ভারতে এক নুতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে সমগ্র এসিয়ায় এক যুগান্তর আনিতে পারে, আশা করা যায়। ঐ কারখানায় ইস্পাতের পাত প্রস্তুত হইতে থাকিলেই বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে এবং এই ভারতই যে কালে প্রাচ্য ভূখণ্ডের জাহাজ, লৌহ ইস্পাত কল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? বৃহদাকার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, প্রচুর মূলধনের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে এবং প্রভূত শ্রম-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে এই সমস্তই সম্ভব।

এ সকল ব্যবসায়ে পারিবারিক শিল্পের কোন স্থানই নাই

বৃহদাকার খনিজ ও ধাতব পদার্থের কারখানার কথা ছাড়িয়া তুলা ও পাট ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে ইহারা উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে ইহার সহিত দেশীয় পারিবারিক-শিল্পের কিছুমাত্র প্রতিযোগিতা নাই বরং পারিবারিক-শিল্পের সাহায্যে ইহা নানা প্রকারে পুষ্টি লাভ করিতেছে। কারখানায় যে সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা দেশীয় তাঁতে

অতি সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশীয় তাঁতে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় এরূপ বলা যাইতে পারে। যদিও বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানী হইতেছে তথাপি আশা করা যায় স্বদেশী তাঁতের উন্নতি হইলেই এই আমদানী বন্ধ হইবার অনেকটা সম্ভাবনা থাকিবে। পাটের কলেরও সহিত গৃহ-শিল্পের কোন প্রতিযোগিতা নাই। গৃহ-শিল্পে অধিকাংশই মোটা কম্বল, গালিচা, শতরঞ্জ, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পাটের ব্যবসায়ের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে পাট আমাদের একচেটিয়া ব্যবসায় এবং ইউরোপীয় ব্যবসা-বুদ্ধি ও মূলধন দ্বারাই ইহা সর্ব্বত্র পরিচালিত হইতেছে।

ভারতে কয়েকটি মাত্র চিনির কারখানা আছে; কোনটিরই অবস্থা সুবিধাজনক নহে। ভারতে আধুনিক রকমের চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নানা প্রকার বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। উপযুক্ত মূল্যে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু সংগ্রহ করা দুষ্কর। সমগ্র দেশে উৎপন্ন ইক্ষুর অর্দ্ধেকাংশ যুক্ত প্রদেশে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য প্রদেশে ইক্ষুর চাষ অপেক্ষাকৃত কম, বৃহদাকার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা এজন্য যুক্তিসঙ্গত নহে।

অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার অনেক সুবিধা ও স্বাধীনতাও রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্য বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে গুড়ের আমদানী অপেক্ষা কাটতি অনেক বেশী; সুতরাং সেখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলিই উন্নতি লাভ করিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের পরেই বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া

থাকে ; কতকগুলি চিনির কারখানাও এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সকলগুলির অবস্থাই শোচনীয়। বৃহৎ কারখানা উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষু সরবরাহের অভাবে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে পারিতেছে না। সুতরাং চিনি তৈয়ার করিবার জন্য বৃহৎ কারখানার সৃষ্টি করিলে চলিবে না. বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে এবং এই জন্য সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

চর্ম্মের ব্যবসায়ে গৃহশিল্প অপেক্ষা কারখানায় নানা প্রকার সুবিধা আছে। চামড়া উপযুক্ত মূল্যে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে এবং চর্ম্ম সংস্কারের পক্ষেও বিদ্যুৎশক্তি বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। এজন্য বৃহদায়তন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি জীর্ণ চর্ম্মদ্রব্য সংস্কার, জুতা মেরামত, সৌখীন তা ও অন্যান্য চর্ম্ম দ্রব্য প্রস্তুত করণ, পুস্তক বাঁধাই প্রভৃতি কার্য্যেই আবদ্ধ থাকিবে।

চর্ম্মের কারখানার মত, তৈলের কল, ময়দার কল, পশমী বস্ত্রের কল, কাগজের কল প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ব্যবসায়ে সফলতার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই সমস্ত ব্যবসায়ে আমরা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কাঁচ প্রস্তুত করিবার জন্য দেশে কোন কারখানাই স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইউরোপে বেলজিয়াম ও বোহিমিয়া এই দুইটি প্রদেশে এবং জাপানে কাঁচের দ্রব্য সামগ্রী গৃহ-শিল্পের দ্বারাই প্রস্তুত হইতেছে এবং গৃহ-শিল্পগুলিই সর্ব্বত্র কাঁচের দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেছে। আমাদের দেশের কাঁচের দ্রব্য তৈয়ারী

করিবার জন্য বড় কারখানা স্থাপন না করিয়া গৃহ-শিল্পই প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য।

ব্যবসায়-"ধুরন্ধরে"র আবশ্যকতা

বৃহদাকারের কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধা এবং অসুবিধার বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমাদের দেশে ঐরূপ কারখানা যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিবেন এরূপ উদ্যোক্তা ও ধুরন্ধরগণের বিশেষ অভাব। যুবকদিগকে শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি মাত্র বিদ্যালয় আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যেরই আদর, শিল্প ও ব্যবসায়েব দিকে ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা নাই। এই কারণে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ শিক্ষকতা, ওকালতী এবং গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া জীবিকার্জ্জন করে, বিজ্ঞানে. ব্যবসায়ে ও ও যন্ত্রবিদ্যায় ক্বচিৎ পারদর্শী হইয়া থাকে। আমাদের বৈষয়িক অভাবসমূহ দূর করিবার জন্য আমাদের দেশে এরূপ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহার ফলে যুবকগণ ব্যবসায়ের কূট সমস্যা সমূহ মীমাসা করিবে, বিচিত্র শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের প্রাকৃতিক দ্রব্য-সম্ভারের সদ্ব্যবহার করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির সহায় হইবে। দেশে এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। কাজেই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমাদের ছাত্রদিগকে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাইতে হইবে, ছাত্রদিগকে ব্যবসায় ও শিল্পের দিকে বিশেষ আগ্রহান্বিত করিতে হইবে, ছাত্রগণ যাহাতে

বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বড় কারখানা অথবা গৃহ-শিল্পগুলি নিজে পরিদর্শন করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া কার্য্যক্ষম হইতে শিখে। এইরূপে যখন তাহারা ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া আসিবে তাহাদিগকে কার্য্য অনুসন্ধানের জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতে হইবে না। কাজই মানুষ খুজিয়া লইবে, মানুষ কাজের অন্বেষণে ব্যগ্র হইবে না। বাস্তবিক বিদেশের কল কারখানায় শিক্ষানবিশরূপে কার্য্য করিয়া ছাত্রগণের যাহাতে ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্মে সে বিষয়েই প্রধান লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে কাজের লোক হইতে হইলে, ব্যবসায়-পরিচালনে ধুরন্ধর হইতে হইলে, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিলে চলিবে না, পরন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক জ্ঞান ও কার্য্য-কুশলতার অভাবের জন্যই ভারতে সমস্ত ব্যবসায়েরই দুরবস্থা। যদি আমাদের ধুরন্ধরগণ বিদেশে অবস্থানকালে বৈজ্ঞানিক কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক কার্য্যক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা করিতেন তবে বিগত দশ বৎসরের মধ্যে দেশে প্রতিষ্ঠিত কল কারখানাগুলির এই দুর্দ্দশা হইত না।

বাণিজ্য-শিক্ষা

কৃষি ও শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষা-প্রণালীও প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাহাতে মহাজন, দালাল, প্রভৃতিও

শিক্ষিত হইয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কার্য্য বহুপরিমাণে নানাস্থানে বিস্তার করিবেন। তাঁহারা নানাস্থানের বাজার দরের সংবাদ রাখিবেন এবং কোথায় কোন জিনিষের আবশ্যকতা বেশী এবং কোন জিনিষের কোথায় কাট্‌তি কম ইত্যাদি সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করিবেন। এই বিষয়ে আজকাল ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে ইউরোপীয় বণিকদের কথার উপরেই সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হয় এবং ইহারাও নিজেদের স্বার্থের জন্য অনেক সময়ই প্রতারণা অবলম্বন করিয়া থাকে; ইহা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ভারতের যুবকদিগকে এই সমস্ত অভাব দূর করিবার জন্য পুরুষ পরম্পরাগত কুসংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শারীরিক পরিশ্রমকেও সম্মানের চক্ষে দেখিতে হইবে এবং ইউরোপীয় বণিকগণের স্থান অধিকার করিবার জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইতে হইবে। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যাহাদের এখনও বাধা আছে তাহাদেরও এ বিষয়ে নৈরাশ্যের কিছুই নাই, ভারতেই ঐরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ ব্যবসায় উদ্যোগী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা দালাল, বণিক ও মহাজন হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। বর্ত্তমানে জগতে কারিগর অপেক্ষা বণিকদিগের আদর কোন অংশেই কম নহে। কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে মার্কিন ও জার্ম্মাণীর ব্যবসায় জগতে উন্নতির কারণ যে তাহাদের শ্রমশক্তি

অধিক নিপুণ, তাহাদের ধুরন্ধরগণ অধিক উদ্যোগী তাহা নহে; বিদেশসমূহের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ, সকল দেশের বাজারসমূহে দ্রব্যবিশেষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান, বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বোপরি বাণিজ্য সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান ও বাণিজ্য পরিচালনের ক্ষমতাই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার মূল উপাদান। ভারতে এইরূপে বাণিজ্য শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে কিন্তু আমরা এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই এবং সমাদর করিতেও শিক্ষা করি নাই। দূরবর্ত্তী স্থানের বাজারদর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কতকগুলি নিরক্ষর বণিক গণই দেশের বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্যের পরিচালনা করিতেছে। তাহারা আধুনিক বিজ্ঞাপন-প্রথা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোকদিগের সহিত ব্যবসায় চালাইতেও অনুপযুক্ত। পক্ষান্তরে বহির্বাণিজ্য সমস্তই বিদেশীয় বণিকদিগের হস্তে ন্যস্ত; তাহারাই লাভের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া থাকে। এখন আমরা চাই—আমাদের শিক্ষিত এবং উপযুক্ত যুবকগণই তাহাদের স্থান অধিকার করুক, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হউক, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বাজারদর ও বিবিধ তথ্য অবগত হউক এবং দেশে ও বিদেশে কোথায় কোন্ জিনিষের অভাব বা আধিক্য তৎসম্বন্ধে আমাদের কারিগর ও শিল্পীদিগকে উপদেশ দান করুক। তাহাদিগকে বাণিজ্যাদির বিস্তৃত বিবরণী, কৃষিবিভাগের খতিয়ান এবং কল কারখানা ও ব্যবসায় সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ পাঠ করিতে হইবে ও অভিজ্ঞতাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে অল্পমূল্যে দ্রব্য সরবরাহ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের প্রয়োজনাধিক্য প্রভৃতি অনুসন্ধান করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে প্রত্যেক জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় ও হাটে হাটে কার্য্যোপযোগী দ্রব্য সমূহের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সমস্ত দ্রব্য চালান করিবার সহজ উপায় নির্দ্ধরণ করিতে হইবে। তাহাদেরকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে, যৌথকারবার ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, বাজারের মূল্যের পরিবর্ত্তনসমূহ লক্ষ্য করিতে হইবে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে দেশে কি পরিমাণ শস্য ও কলকারখানাজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। এইরূপে ভারতে ব্যবসায়ী এবং বণিক জাতির সৃষ্টি হইবে। তাহারাই প্রদেশীয় বণিকজাতির সকবল হইতে ভারতকে রক্ষা করিবে।

অবস্থা ও ব্যবস্থা

এ সমস্ত ভবিষ্যতের আশা। আমাদের সম্মুখে এখন কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই মীমাংসা করা প্রয়োজন। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নিতান্ত অল্প এবং ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈজ্ঞানিক কৌশল ও ব্যবসায় বাণিজ্যে কার্য্যক্ষমতা এবং মূলধনের অভাবেই কলকারখানা স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিতেছে না। বহু অর্থ অনেক সময় বিলাসে ব্যয়িত হয় অথবা সিন্ধুকের

শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে মাত্র। ভারতের অধিকাংশ কারখানাই সামান্য মূলধনে আরব্ধ হইয়াছে এবং ইহার পরিণাম যে বিষময় তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; অল্পমূল্যে পুরাতন কল ও যন্ত্রাদি ক্রীত হইয়া থাকে এবং এইরূপে মিতব্যয়ী হইতে যাইয়া আমরা অব্যবহার্য্য যন্ত্র ক্রয় করিয়া থাকি। উপরন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই অধিক পরিমাণ লভ্যাংশের জন্য লালায়িত না হইয়া ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে ক্ষতির জন্য সংস্থান এবং দূরদর্শিতাই যে কৃতকার্য্যতালাভ করিবার মূলসূত্র তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাদের সামান্য রকমের শিল্পনৈপুণ্য ও কার্য্যক্ষমতা আছে তাহাদের সামান্য মূলধনই যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং এরূপ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হইবে যাহাতে ক্ষতির কোন সম্ভবনা না থাকে; কারণ ব্যবসায় ও শিল্পের প্রারম্ভে একবার ক্ষতি হইলে তাহা সমস্ত দেশব্যাপী একটা নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতে শিল্প ও কারখানার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়। সুতরাং বৃহদাকারের কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে আমাদের বর্ত্তমান মূলধন পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতা প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়-গুলি পরিচালিত করিতে পারিলেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারি। লোহার কারখানা, কাঁচের কারবার, বস্ত্রবয়ণ এবং রঞ্জন, কাগজের কল প্রভৃতি অনুষ্ঠান আরম্ভ করা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নহে; বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে ছুরি, কাঁচি, পেরেক, ছাঁচে ঢালাইকরণ এবং কপাটের কব্জা প্রভৃতি লৌহ

কারখানার সামান্য সামান্য কাজগুলি আরম্ভ করা যাইতে পারে। বোতল, বলয়, এবং ভগ্ন কাঁচের জিনিষ হইতে নানাপ্রকার সাধারণ ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, সূত্র প্রস্তুত ও হস্ত-চালিত বস্ত্রসমূহের উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে ; আলকাতরা, ভাতে রং (aniline), নীল ও অন্যান্য দেশী রং দ্বারা ছিটের কাপড়, রঞ্জিত বস্ত্র. সূত্র ও রেশম প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; পীস্‌বোর্ড (Paste board) ও (Card board) প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; সোডা, সোরা প্রভৃতিও সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এখন বেশী চাক্‌চিক্যের দিকে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই বরং যাহাতে অল্পমূল্যে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য সরবরাহ করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অল্পমূল্যতা এবং প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ,—ভারতে এই দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কারখানায় দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান মূলধন, উদ্যোগ, উৎসাহ এবং কর্ম্ম-ক্ষমতা উল্লিখিত কার্য্যসমূহে নিয়োগ করিতে পারিলেই—ভবিষ্যতে উন্নতি সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পল্লীচর্য্যা বিধান

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামবাসীরা রোগে ও অন্ন কষ্টে ক্রমশঃ শীর্ণ এবং হীনবল হইয়া পড়িতেছে। কৃষির অবনতি হইয়াছে. শিল্পসমুদায়ও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসিগণের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবনতি দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের এইরূপ অবনতির জন্যই আমরা ক্রমশঃ দীনহীন হইয়া পড়িতেছি; কারণ (ক) সকল দেশেই পল্লীবাসিগণ সমাজের প্রধান বল ও অবলম্বন স্বরূপ (খ) আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া অধিকাংশ লোকই পল্লীবাসী; সুতরাং নগর অপেক্ষা গ্রামগুলিরই লোকসংখ্যা এবং সমাজ-শক্তি অধিক। (গ) অতীতকালে পল্লীগ্রামগুলিতেই আমাদের সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছিল; ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার মত নগরগুলিকে অবলম্বন না করিয়া পল্লীগ্রাম সমূহেই পুষ্ট হইবে, তাহা না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

বাস্তবিক পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন আমাদের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়।

আমাদের দেশের পল্লীবাসিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব নাই।* সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়। যাহাতে কার্য্য করিবার এই প্রণালী পল্লী-

সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সম্যক্ ও সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। দরিদ্র এবং দুর্ব্বল কৃষক শিল্পী ও শ্রমজীবী একক হইয়া কাজ করিলে কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। এই মূল সূত্র মনে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

(ক) কৃষিবিষয়ক

একে একে স্বতন্ত্রভাবে মহাজনের নিকট অধিক সুদে কর্জ্জ না লইয়া গ্রামের সকল কৃষক মিলিত হইবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্জ্জের দায়িত্ব লইয়া যৌথ-ঋণ-দানমণ্ডলী গঠন করিবে. এই উপায়ে তাহারা অল্প সুদেই মহাজনের নিকট কর্জ্জ পাইবে ; সকল কৃষকগণের অর্থ সাহায্যে পাইকারী দরে শস্যের বীজ, সার এবং কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা, এবং গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন, চিকিৎসা ও সুস্থ সবলকায় বৎস্য উৎপাদনের উপায় বিধান করিতে হইবে ; সাধারণ গোশালা স্থাপন করিয়া গোপগণকে সমবেতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধের বিশুদ্ধি রক্ষা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) শিল্পবিষয়ক

শিল্পিগণ, ব্যক্তিগত ভাবে পাইকারদিগের নিকট দাদন না লইয়া মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করিবে, এবং পরস্পরের কর্জ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অল্প সুদে মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইবার

ব্যবস্থা করিবে; পরস্পরের অর্থ সহায়তায় তাহারা অধিক মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও দ্রব্য প্রস্তুত করণের উপকরণ সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) বাণিজ্য বিষয়ক

কৃষকগণ ব্যক্তিগত ভাবে দালাল ও পাইকারগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিয়া আপনাদের ন্যায্য লাভ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়, ইহার প্রতিকারস্বরূপ সকলে মিলিয়া পাইকারী দরে সমবেত প্রণালীতে শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; শস্যের অবাধ রপ্তানি সংযত করিতে হইবে; খাদ্য শস্যের বিনিময়ে বাণিজ্যোপযোগী শস্যের আবাদ হ্রাস করিতে হইবে; সাধারণ শস্য-গোলা স্থাপন করিয়া শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া পল্লীবাসিগণের নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে সুবিধা দরে ক্রয় করিয়া আনিয়া লাভ না করিয়া পাইকারী দরেই পল্লীগ্রামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামজাত শিল্পদ্রব্যাদি ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কগণ কর্ত্তৃক বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাবৎকাল বিক্রয় না হয় তাবৎকাল শিল্পীগণকে আহার্য্য ও বস্ত্রাদি কর্জ্জ দিতে হইবে; মেলা ও হাটে গ্রাম্য কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) শিক্ষাবিষয়ক

গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবহারিক বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে

আপনার দৈনিক হিসাব লিখিতে এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে; কারখানায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্য্যপ্রণালী প্রচার করিতে হইবে; ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিযন্ত্র সার ইত্যাদি অথবা শিল্পকার্য্যের যন্ত্রপাতী এবং উপকরণ দ্রব্যসামগ্রী সমবেতভাবে ক্রয় করিবার সুযোগ বিধান করিতে হইবে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি লোকশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থগুলির চিত্রশোভিত, সুখপাঠ্য আধুনিক সংস্করণ সমুদায় বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে; স্থানে স্থানে পাঠাগার স্থাপন করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ পুস্তক রাখিয়া জনসমাজে ঐগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে; পল্লীগ্রামে ফকির, ভিক্ষুক এবং বৈরাগীর গান ও ছড়াগুলি যাহাতে নূতন সমাজ এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) স্বাস্থ্যবিষয়ক

পল্লীবাসিগণের সমবেত উদ্যোগ ও উদ্যমে গ্রামের বন-জঙ্গল পরিষ্কার, নদী, খাল, পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার সাধন, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী, কূপাদি খনন ও সেইগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি

পল্লীচর্য্যা বিধান

মারিভয়ের সময়ে রোগিচর্য্যা এবং রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; দেশের গাছ গাছড়া ইত্যাদির গুণাভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সহজ এবং সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামবাসিগণের শ্রমময় জীবনকে কথঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য পল্লীক্রীড়া, আমোদ ব্যায়াম প্রভৃতির উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। এই সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুল বিস্তৃত হইয়া, আমাদের জাতীয় অবনতি প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় একনিষ্ঠ কল্যানকর্ম্মী পল্লীসেবকের প্রয়োজন। পল্লীসেবকগণের ভাবুকতা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই পল্লীসেবকগণের কল্যানকর্ম্মে সুবিধা ও সুযোগ বিধানের জন্য দেশের শিক্ষিত ধনী এবং জমিদারবর্গকে মুক্তহস্ত ও সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

কৃষি ও শিল্পকর্ম্মে সমবায়

আমাদিগের কৃষক এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে সমবায়-অনুষ্ঠান ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। সমবেত দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ করিলে অনেক সুবিধা আছে। প্রত্যেক ঋণের দায়িত্ব যদি কয়েকজন বন্ধু মিলিত ভাবে ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে ঋণদাতা মহাজনগণের অর্থনাশের কোন আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং সুদের হার কমিয়া যায়। এই উপায় অবলম্বন করিলে প্রত্যেক ১০০৲ ঋণের সুদ গড়ে অন্যূন ১০৲ কমিতে দেখা গিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে সমবায়-সমিতিগুলি ১৫০ লাখ টাকা ধার দিয়াছে। অতএব সমবায়-প্রথায় ঋণ গ্রহণ করিয়া কৃষক এবং শ্রমজীবিগণের ১৫ লাখ টাকা সুদ ভার কমিয়াছে।

বাঙ্গলাদেশের সমবায়-সমিতির সংখ্যা ৯৪৩ এবং সভ্যগণের সংখ্যা ৩৮,৫৬৯। সমগ্র ভারতবর্ষে সমবায়-সমিতির সংখ্যা ৮১৭৭, ভারতীয় সমিতি সমূহের সভ্যগণের সংখ্যা এখন ৪০৩,০০০ হইয়াছে।

সমবেত-ঋণদান-সমিতি গঠনের অনেক আনুসঙ্গিক উপকার আছে। সমবায়-সমিতির সভ্যেরা তাহাদিগের গৃহীত অর্থ অসৎ-পথে ব্যয় করিতে পারে না। তাহার জন্য তাহাদিগের কার্য্যের প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকে। অনেক স্থলে কৃষিকার্য্য অথবা

শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্য ব্যতীত ঋণ দেওয়াই হয় না। যে স্থলে শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ঋণ দেওয়া হয়, সে স্থলে ঐ সমস্ত কার্য্যে কত অর্থ ব্যয় করা উচিত সভ্যেরা তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এরূপে সামাজিক বিষয়েও সমবায়-সমিতির বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। সমিতির কোন সভ্য সমিতির পরামর্শ না লইয়া মোকর্দ্দমা করে না, এরূপে অনেক মোকর্দ্দমা সভ্যেরা নিজেরাই নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। কেবলমাত্র একটি জেলায় ১১০০ দেওয়ানী মোকদ্দমা গত বৎসর মিটিয়া গিয়াছে। জলাশয় খনন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, স্বাস্থ্যোন্নতি, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতিতে ও সমবায়-সমিতি বিশেষ সহায়তা করে। বাস্তবিক পক্ষে সমবায়-সমিতিগুলি পল্লীজীবনে একটি নূতন স্রোত আনিয়া দিতেছে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দবর্দ্ধন এবং দশের উন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টার সূচনা দেখা গিয়াছে,—বোধ হয় আমাদিগের গ্রামগুলি এই উপায়ে নূতন জীবন লাভ করিবে। ,

যে সকল জেলায় অনেকগুলি সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে কেন্দ্র-সমবায়-সভার ও সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্র সভাগুলি সমিতি সমূহের তত্ত্বাবধান এবং তাহাদিগের জন্য অর্থ সংগ্রহের ভার লয়। বাঙ্গালা দেশে এইরূপে অনেকগুলি কেন্দ্র-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—(ক) পূর্ব্ব বঙ্গ কেন্দ্র-সভা (খ) বেলবেড়া কেন্দ্র-সভা মেদিনীপুর (গ) রাড়ুলী কেন্দ্রসভা, খুলনা (ঘ) কালিমপঙ্গ কেন্দ্র-সভা (ঙ) রামপুরহাট কেন্দ্র-সভা বীরভূম (চ) টাকি কেন্দ্র-সভা

ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত পাবনা এবং সদরপুরে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বাবধায়ক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে—(ক) গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে (খ) কেন্দ্র-সভা এবং সহরের সমবায়-সমিতি হইতে (গ) সভ্যেরা নিজেরা সমিতিতে স্বকীয় সঞ্চিত অর্থ প্রদান করে। বাঙ্গালাদেশে গ্রাম্য সমিতিগুলির মোট মূলধন ১৪,৭১,৬৭০৲।

সমবেত-ঋণ দান সমিতিগুলি ব্যতীত অন্য প্রকার সমবায়ের অনুষ্ঠানও আছে। আমাদিগের কৃষকেরা অনেক সময়ে দলবদ্ধ হইয়া জমির লাঙ্গল দেয় অথবা সার ক্রয় করে। ইক্ষু চাষের পর কৃষকেরা সমবেত হইয়া ইক্ষুভাঙ্গা যন্ত্র ক্রয় বা ভাড়া করে। আমাদিগের দেশ হইতে এরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে জর্ম্মানী, ফ্রান্স বেলজিয়ম এবং অষ্ট্রিয়া প্রদেশে এই প্রকার সমবায়প্রণালীর দ্বারা কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কৃষকেরা সমবেত হইয়া জমি, লাঙ্গল এবং সার ক্রয় করে এবং ফসলোৎপাদনের পর গ্রামের সমস্ত ফসল সমিতিকে প্রদান করিয়া সমিতির দ্বারাই বিক্রয় করিয়া লয়। ইহাতে তাহাদিগের বিশেষ লাভ এবং সুবিধা হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে কৃষকগণের মধ্যে এরূপ সমবেত প্রণালীতে ক্রয় এবং বিক্রয়-সমিতি স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। শিল্পীদিগের জন্যও সমাবয়ের অনুষ্ঠান বিশেষ হিতকর। সমবায়প্রথা, অবলম্বন করিলে ন্যায্য দামে শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্র এবং দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারা

যায়। সমবায়-ভাণ্ডার স্থাপন দ্বারা তাহাদিগের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তন্তুবায়-দিগের জন্য এরূপ অনেকগুলি সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে এরূপ সমিতি স্থাপন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

অষ্টম অধ্যায়

বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্যে বণিকের আধিপত্য ও প্রতিকার

আসন্ন দুর্ভিক্ষ

সেদিন এক ভীষণ জলপ্লাবন বাংলা দেশের অনেকগুলি জেলাকে বিধ্বস্ত করিয়া গেল। অসংখ্য গো-মহিষাদি পশু বিনষ্ট হইল। অসংখ্য লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল। অসংখ্য লোক এখনও অন্নাভাবে প্রপীড়িত রহিয়াছে, এক মুঠা অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। অতিবৃষ্টির পর কয়েক জেলায় অনাবৃষ্টি হইল। সকলেই বলিতেছেন, এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ তাহার করাল মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, অতি-বিস্তার-বদনা, অসংখ্য-নরকঙ্কাল-শোভিতা সে দানবী সমগ্র বাংলা দেশকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। সকলেই এজন্য ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষ এদেশে যে নূতন, তাহা নহে। দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, অনেক লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাণে এমন কি সম্বৎসর ধরিয়াই দেখা যায়। বাস্তবিক যদি দুর্ভিক্ষ অর্থে আমরা ভিক্ষা-সংগ্রহের

দুঃসাধ্যতা বুঝি, তাহা হইলে অনেক জেলাই আধুনিক কালে দুর্ভিক্ষপীড়িত। আমাদের দেশে এখন কালের নিয়মে দুর্ভিক্ষ অর্থে অন্নাভাবে মৃত্যু বুঝায়, কেবল অন্নদাতার অভাব বুঝায় না। কাজেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলেই সকলেই শিহরিয়া উঠে।

দুর্ভিক্ষের কারণ

দুর্ভিক্ষের কারণ কি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অনেকেই বলেন, দুর্ভিক্ষের কারণ দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা। পূর্ব্বে এক টাকায় এমন কি একমণ চাউল ক্রয় করিতে পারা যাইত এক্ষণে এক টাকায় অনেক সময়ে চারি পাঁচ সের চাউল ক্রয় করিতে হয়। কাজেই অর্থাভাব বশতঃ দরিদ্রেরা চাউল ক্রয় করিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে, দ্রব্যসমূহের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক দ্রব্যের মূল্য নয়-দশগুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে. কিন্তু তাহার জন্য ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার সহিত দুর্ভিক্ষও জড়িত. কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে তাহা নহে। বাস্তবিক আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে কেবলমাত্র দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না।

আমাদের দেশে দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা শুধু নহে, দুর্ম্মূল্যতার সহিত দ্রব্যাভাব দেখা দিয়াছে। দ্রব্যাভাবই দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে অন্য দ্রব্যের সহিত চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে,—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেশে চাউলের অভাব।

(ক) কৃষিকার্য্যের অবনতি

এই চাউলের অভাবের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিব, এবং তাহা বুঝিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। দেশে নানা কারণে কৃষির অবনতি হইতেছে—(ক) কৃষকগণ দারিদ্র্য হেতু উপযুক্ত সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অক্ষম, (খ) উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহারা সার এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার জানে না, (গ) গো-জাতির ক্রমশঃ অবনতি দেখা যাইতেছে, (ঘ) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণে কৃষকগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, (ঙ) রেল-লাইন স্থাপন প্রভৃতি কারণে জল সরবরাহ হইতেছে না, (চ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসাতে কৃষকদিগের উৎসাহ নাই। এই সমস্ত কারণে দেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

(খ) বিশেষতঃ খাদ্য-শস্য চাষের অবনতি—পাট আবাদ

দেশে যে কেবল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কমিতেছে তাহা নহে; যে সকল ফসল বিদেশে রপ্তানি হইয়া বিদেশীয় বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় সেই সকল ফসলই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। দেশবাসীগণের অন্নসংস্থানের সহায় না হইয়া আমাদের কৃষককুল বিদেশীয় কারখানায় উপকরণ-সামগ্রী যোগাইতেছে। বাংলা দেশে পর পর নীল তুঁত এবং পাটের চাষ ধান্যচাষের মতনই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে নীল এবং তাহার পর তুঁত চাষ করিয়া

কৃষকগণ মনে ভাবিয়াছিল তাহারা হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে। তাহারা কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল সত্য; কিন্তু নীলকর এবং কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার-কাহিনী নীল এবং তুঁত আবাদের বিষময় ফল সম্বন্ধে আজও পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতেছে—বাংলা দেশের কৃষকসমাজ কখনও সে অত্যাচার-কাহিনী ভুলিতে পারিবে না। নীল এবং তুঁত চাষের পর পাটের চাষ খুব প্রচলিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাট প্রথম বিলাতে রপ্তানি হয়; ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতার কাষ্টম্ হাউস পাট রপ্তানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। সে বৎসর ৪৯৬ মণ পাট রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

পাট আবাদের পরিমাণ

	১৯১২,	১৯১৩
বঙ্গদেশে	২,৫৭৬,৫০৩	২,৭৫৫,১৬৬ + ১৭৮,৬৬৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২৯৮,৩৪৪	৩১৮,৩৫৮ + ২০,০১৪
আসাম	৯৫,৬৪৭	৯৬,০৯০ + ৪৪৩
মোট	২,৯৭০,৪৯৪	৩,১৬৯,৬১৪ + ১৯৯,১২০

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বত্রই অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

বিহারেও পাটের আবাদ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, কয়েক বৎসরের আবাদী জমির পরিমাণ দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়,—

১৯০৯	...	২৪১,৪০০ একর
১৯১০	...	২৪৮,২০০ "
১৯১১	...	২৫৮,১০০ "

১৯১২	...	১৯৮,৩০০	"
১৯১৩	...	৩৩৮,৪০০	"

এখনকার পাটের সুবিধা আছে। কুঠিয়ালগণ নিজেরাই মুখ্যভাবে পাটের চাষ পরিচালন করিতেছে না। পাটের চাষ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এবং এক্ষণে উহা বিস্তৃত হইতেছে ; এবং এই বিস্তৃতির জন্য কুঠিয়ালগণ অপেক্ষা দালাল পাইকারগণই অধিক দায়ী হইয়াছে, কাজেই নীলকরদিগের অত্যাচার আবার দেখা দেয় নাই। কিন্তু নীল এবং তুঁত আবাদের মত পাট আবাদের একটা প্রধান দোষ আছে। পাট খাদ্য-শস্য নহে। কাজেই পাট অধিক পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ অবশ্য হ্রাস পাইবে। কোন দেশের শ্রমজীবীর শক্তি এবং মূলধনের পরিমাণ অসীম নহে, তাহা নির্দ্দিষ্ট। অতএব বিদেশে রপ্তানির জন্য যদি পাট উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা হইলে অচিরেই চাউলের চাষ কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে জমিতে চাউল হয়, সেই জমিতে পাটও হয়, পাটের বাজার-দর অধিক হওয়াতে কৃষকগণ অধিক খাজানা দিয়া জমিদারের নিকট হইতে চাউল আবাদ ছাড়িয়া পাট আবাদের জন্য জোত লইয়া থাকে। এরূপে দেশে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। বাস্তবিক পাট তিসি প্রভৃতি উপকরণ-শস্যের চাষ বাড়িয়া যাওয়া দেশের পক্ষে প্রভূত অনিষ্টকর। দেশে যে দুর্মূল্যতা দেখা গিয়াছে তাহার একটা প্রধান কারণ খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কমিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকাটী পাঠ করিলে আমরা হ্রাসের পরিমাণ বেশ বুঝিতে পারিব—

	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
১। চাউলের চাষের পরিমাণ (মিলিয়ন একর পরিমাপক হিসাবে)	৭০	৭১·৬	৬৯·৬	৭৩	৩·৪	৭৩·৫	৭৫·৯	৭২·৮	৭৮·৭	৭৮·৫	
২। গম চাষের পরিমাণ (মিলিয়ন একর পরিমাপক হিসাবে)	১৮·৬	১৯·৬	২৩·৬	২৩·	২·৪	২৫·১	১৮·৪	২১·২	২২·৭	২৪·৪	

এই কয় বৎসরে পাট এবং তুলার চাষ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাও নির্দ্দেশিত হইল :—

১। পাটের চাষ (মিলিয়ন একর)	২·১	২·১	২·৫	২·৯	·১	৩·৫	৩·৯	৮৫	২·৮৭	২·৯৩	৩·১
২। তুলার চাষ (মিলিয়ন একর)	১০·৩	১১·১	১১·৯	১৩	১৩	৩·৭	১৩·৯	২৯	১৩·১	১৪·৪	

১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা বলমাত্র ৭·১৭ বৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু তুলা ও পাট চাষের পরিমাণ ঐ দশ বৎসরেই শতকরা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাট ইত্যাদি উপকরণ-শস্য চাষের কুফল

মুর্শিদাবাদ জেলায় একজন খুব ধনী এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার তাঁহার বাটীতে একবার তাঁহার জমিদারীর সমস্ত প্রজাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজনের জন্য সকলেই উপবিষ্ট হইলে জমিদার মহাশয় তাহাদিগের সম্মুখে আসিলেন এবং তাঁহার পাচকগণের দ্বারা তাহাদিগকে পাটের কুচি পরিবেষণ করাইলেন। প্রজাগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জমিদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় আমাদের জন্য এ কি খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন?" জমিদার মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন "দেখ, তোমরা আমার জমিদারীতে যাহা উৎপন্ন করিবে তাহা ভিন্ন অপর খাদ্য আমি কোথায় পাইব? তোমরা ধান্য চাষ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সর্ব্বত্রই পাট চাষ আরম্ভ করিয়াছ, অতএব, পাট ব্যতীত তোমাদিগের অপর কোন খাদ্য আশা করা অনুচিত।" প্রজাবৃন্দ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া জমিদার মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যখন তাহারা স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন সকলেই জমিদার মহাশয়ের উপাদেয় এবং কৌতুকপ্রদ শিক্ষাপ্রণালীর প্রশংসাবাদ করিতেছিল। সেই অবধি মুর্শিদাবাদের ঐ অঞ্চলে পাট চাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। জমিদার মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক সত্য এবং স্পষ্টভাবে বলা। জেলায় জেলায় যদি খাদ্য-শস্যের চাষ কমিয়া যায় তাহা হইলে সে দেশে অন্নাভাব না হওয়াই আশ্চর্য্য। কৃষকগণ পাট প্রভৃতির চাষে যদিও কিছু নগদ টাকা লাভ করিতে

পারে, কিন্তু চাউলের মূল্য ততোধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহারা অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। বিদেশী বণিকদিগের প্রভাবে দেশীয় কৃষি বিদেশের প্রভূত ধনোৎপাদনের সহায় হইয়া যদি দেশবাসীগণের দারিদ্র্য আনয়ন করে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মূঢ় কৃষি-ব্যবস্থা স্বপ্নের অগোচর। আমরা কিন্তু এই মূঢ় ব্যবস্থা অন্ধভাবে পুরুষানুক্রম ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছি।

(গ) খাদ্যশস্য রপ্তানি

শুধু খাদ্য-শস্যের চাষ যে কমিতেছে তাহা নহে, আমরা নিজেদের অভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বহুল পরিমাণে খাদ্য-শস্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছি। এস্থলেও বিদেশী বণিকদিগের প্রভাব হইতে আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ রহিয়াছেই। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই খাদ্য-শস্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে।

	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
চাউল রপ্তানি (মিলিয়ন cwt পরিমাপক হিসাবে)	৩৪	৪৭·৪	৪৫	৪৯·৪	৪৩	৩৮·৭	৩৮·২	৩০·২	৩৯·২	৪৮	৫২·৪
গম রপ্তানি (মিলিয়ন cwt পরিমাপক হিসাবে)	৭·৩	১০·৩	২৫·৯	৪৩	১৮·৭	১৬	১৭·৬	২·১	২১	২৫·৩	২৭·২

এক মিলিয়ন cwt. = প্রায় ১৩.৫ লক্ষ মণ।

১৮৯৫ সনে রুশিয়াতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু দেশে অন্নাভাব সত্ত্বেও অসংখ্য রেলগাড়ী শস্য বোঝাই করিয়া রুশিয়া হইতে বিদেশে যাইতেছিল। সেখানকার রাজসচিব হিলকফ ঐ রেলগাড়ী সমূহের বিদেশ যাত্রা নিষেধ করিয়া রুশিয়ায় উৎপন্ন সমস্ত শস্যের দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আদেশ প্রচার করিলেন। দুর্ভিক্ষ থামিয়া গেল। আমাদের দেশে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অনায়াসেই সমস্ত প্রদেশের অন্নাভাব দূরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও আমরা বিদেশে বৎসর বৎসর শস্য রপ্তানি করিতেছি।* কবি স্বদেশকে আহ্বান করিয়া গাহিয়াছেন. "চির কল্যাণময়ি তুমি ধন্য,—দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন।" ধনবিজ্ঞানবিৎ এই প্রকার ব্যবস্থাকে দেশের পক্ষে ঘোর

* শস্য রপ্তানি যে শস্যের দুর্মূল্যতার একটা প্রধান কারণ তাহা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টেও নির্দ্দিশিত হইয়াছে।

"Rice of which the exports have greatly increased during the last two years 1901—03 remains extremely dear," * * * Wheat in India proper, like rice in Burma, is being grown more extensively for export and the recent revival of the foreign demand has produced exports bearing a far larger proportion to the consumption than in the case of rice."

Imp. Gazetteer of India, Vol. III. chap IX. p. 460.

"Of rice it may be said that present prices are as high as the famine prices of former years."

"The demand for export has undoubtedly influenced the price of rice and wheat directly, and through them the prices of the commoner food grains."

Imp. Gazeteer of India, Vol III. chap. IX. p. 461.

অকল্যাণপ্রদ বলিয়া মনে করেন,—নিজের ধন পরকে দিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়া অবশেষে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করা দুর্ব্বলতার লক্ষণ। ইহা স্তুতিবাদের বিষয় নহে। আর একজন কবির আক্ষেপে বাস্তবজীবনের প্রকৃত দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে,—

নিজ অন্ন পরে, পরপণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গসুখে,
তুমি আজও দুখে, তুমি আজও দুখে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়

(ক) কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন

দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে কেবলমাত্র যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে তাহা নহে। খাদ্য-শস্যের চাষ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, এবং উৎপন্ন শস্যের যাহাতে বিদেশে রপ্তানি না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যের উন্নতির উপায়,—কৃষিশিক্ষার বিস্তার এবং যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী এবং যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া কৃষকদিগকে কৃষি-রসায়নসম্মত সার এবং উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করিতে সাহায্য করা। যৌথমণ্ডলী স্থাপন করিলে গো-মহিষাদির উন্নতি এবং জীবনবীমা সহজসাধ্য হয়। ঋণদানমণ্ডলীর লাভাংশ হইতে ষণ্ড ক্রয় করা যাইতে পারে, এবং গবাদির জীবন বীমার জন্য মাসিক চাঁদা লওয়া যাইতে পারে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ হইলে, ঋণদান-মণ্ডলী হইতে কৃষকগণ

অল্প সুদে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া, আহার্য্যাদি, শস্য-বীজ এবং হাল বলদ ক্রয় করিতে পারে। কৃষিশিক্ষা বিস্তৃত হইলে ব্যয় ও সময়-সংক্ষেপকারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন হইবে, উপযুক্ত সার ব্যবহৃত হইবে, এবং পোকা ও অন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষিত হইবে। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে গ্রামে গ্রামে কৃষি-কার্য্যের সমবায়প্রণালী সহজেই অবলম্বিত হইবে।

বাস্তবিক আমাদের পল্লীগ্রামসমূহে দৈন্য দারিদ্র্য এরূপ গভীর এবং বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, যে সমস্ত বিষয়েই এক্ষণে সমবেত কার্য্য করা আবশ্যক। গ্রাম্য কৃষিশিক্ষা পরিচালনার জন্য, নদ নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য,শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থার জন্য, নিয়মমত জলসরবরাহের জন্য সমবেতভাবে কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। সব বিষয়েই সমবেত কার্য্যপ্রণালী কল্যাণপ্রদ হইবে। তাহার পর স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে কৃষিকার্য্যের স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। এই জন্য পল্লীগ্রামসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত গ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য জল সরবরাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রেল লাইন যেখানে খুলা হইয়াছে, সেখানে বাঁধের নীচ দিয়া যাহাতে জল সহজে যাতায়াত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পল্লী-গ্রাম অঞ্চলে ছোট রেলগাড়ী (Light Railway) অধিক উপযোগী। তাহাতে যাতায়াত এবং দ্রব্য আমদানি রপ্তানির সুবিধা হয়, অথচ রেলগাড়ীর ভার অধিক না হওয়াতে বাঁধ নির্ম্মাণ আবশ্যক হয় না। তাহার জন্য রেল লাইন জল সরবরাহের ব্যাঘাত করে

না। ইউরোপের কৃষিপ্রধান দেশসমূহে ছোট রেল লাইনগুলি বৈষয়িক উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছে; অথচ জল সরবরাহের ব্যাঘাত না হওয়াতে নদনদীগুলি ও তাহাদিগের শাখা প্রশাখা-গুলির অবনতি হয় নাই এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি এখনও দেখা যায় নাই। আমাদিগের দেশে কিন্তু পল্লীগ্রামে ছোট রেল-গাড়ীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই চিন্তা করেন নাই।

রেলগাড়ী সম্বন্ধে এইস্থলে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, রেললাইনের বিস্তার আমাদের উন্নতির একটী প্রধান লক্ষণ। রেলগাড়ী মনুষ্যের যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি করে সত্য, এবং রেলগাড়ী ভিন্ন বাণিজ্যক্ষেত্রে উন্নতি হওয়া অসম্ভব তাহাও সত্য। কিন্তু রেলগাড়ী যে সকল সুবিধা প্রদান করিয়াছে তাহাদিগের বিনিময়ে আমরা কি হারাইতেছি তাহাও কি একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে? রেলগাড়ী কৃষিক্ষেত্রে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না, উৎপন্নশস্য লইয়া রেলগাড়ী তাহা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করে মাত্র। গ্রামোৎপন্ন শস্য স্বদেশ অথবা বিদেশের সহরবাসীর আহার্য্য হয়, এই মাত্র। রেলগাড়ী শস্য উৎপন্ন করে না, কৃষকই সমাজের অন্নসংস্থানের ভার লইয়াছে, রেলগাড়ী তাহার বাহন মাত্র। বাহনের কাজ প্রভুকে সেবা করা। কিন্তু বাহন যদি আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত প্রভুর ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে পিষিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সিন্ধুবাদের ভাগ্য এবং চতুরতা না পাইলে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন ঠিক সিন্ধুবাদ নাবিকের দশা হইয়াছে। ইউরোপ আমেরিকায়

রেল লাইন স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে রেলকোম্পানীর নিকট হইতে দেশবাসীরা অনেকগুলি সত্ত্ব আদায় করিয়া লয়। ঐ প্রদেশের শস্যাদি অথবা শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী অন্য প্রদেশে রপ্তানি করিয়া যাহাতে দেশবাসীরা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য কোম্পানী মাশুল খুব কমাইয়া দেয়। সুতরাং রেলকোম্পানী ঐ প্রদেশের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির প্রধান সহায় হয়। আমাদের দেশে রেলকোম্পানীগুলি তাহাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত, কোন শিল্পবিশেষকে সুবিধা প্রদান করিবার জন্য মাশুল কমাইয়া দেওয়া তাহাদিগের আলোচনার মধ্যেই আসে না। তাহার পর, ইউরোপ আমেরিকার পল্লীগ্রাম সমূহে কৃষি এবং শিল্প-শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য রপ্তানি হয় না, গ্রামে গ্রামে শস্য-সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও উপযোগী অনুষ্ঠান আছে এবং উপকরণ-শস্য উৎপন্ন হইলেও গ্রামবাসিগণ নিজেরাই কলকারখানা স্থাপন করিয়া তাহা হইতে আপনাদিগের শিল্পশিক্ষার বলে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং রেলগাড়ী সেখানে কৃষককুলের ধনবৃদ্ধির কারণ। আমাদের দেশের কৃষকগণ সেরূপ শিক্ষিত নহে। কাজেই তাহারা রেলগাড়ীর মন্দটুকু লইয়াছে, ভালটুকু লইতে পারে নাই। রেলগাড়ী সে জন্য সভ্যতা নহে দৈন্যের লক্ষণ হইয়াছে। রেল লাইন সমুদয় যে দেশের অন্তঃপ্রদেশ-মুখী না হইয়া বোম্বাই, করাচী, কলিকাতা প্রভৃতি বন্দরের দিকে ছুটিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায় দেশের রেলগাড়ী দেশবাসীদিগের দৈন্য ও বিদেশবাসীদিগের অর্থলাভের কারণ ভিন্ন আর কিছুই

নহে। জর্ম্মাণী, আমেরিকায় রেল লাইনগুলা অন্তঃপ্রদেশমুখী হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পকর্ম্ম ও অন্তর্বাণিজ্যের উৎসাহ দিয়া থাকে। বাস্তবিক সমগ্র কৃষকসমাজ এক্ষণে বণিকদিগের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আপনার অন্ন পরের হাতে অকুণ্ঠিতচিত্তে তুলিয়া দিতেছে এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পরের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইয়া গৌরব বোধ করিতেছে! তাই যখন রেলে যাই তখনই সন্দেহ হয়, আমরা রেলের সঙ্গে শুধুই কি শিক্ষার উন্নতি, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের দ্বারা জাতীয়তা গঠন, এক কথায় কেবল কি সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাইতেছি; একটা বেদনার সুর,—দৈন্য দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকসমাজের একটা করুণ কাহিনী তখন কি মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে না? যখনই এই করুণ সুরটির উদয় হয়, তখন মনে হয়, এই যে রেল লাইন ইহা পাথরের উপর নহে, দেশের ৩০ কোটি কৃষকের বক্ষের উপর পাতা আছে, আর ঐ যে গুরু গুরু শব্দ তাহা ৩০ কোটি নরনারীর বিদীর্ণ হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ,—কেবল

'বুক ফাটা দুখে
গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা।'

রেল লাইন যতই বিস্তৃত হইতেছে ততই দেশের নদনদীগুলির প্রতি দৃষ্টি আমরা ঘুচাইতেছি। কৃষিপ্রধান দেশে নদনদীগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। আফ্রিকার সাহারা

মরুভূমিতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া কৃষিকার্য্যের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। আমাদের দেশে নদনদীগুলির যেরূপ ক্রমাবনতি লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের শস্যশ্যামল দেশ যদি কোন কালে মরুভূমিতে পরিণত হয় তবে তাহাও আশ্চর্য্য নহে। জল-সেচন এবং বাণিজ্যের সুবিধা হেতু নদনদীগুলির উন্নতি সাধন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ড্রেজার বসাইয়া নদীর মোহানার চর কাটিয়া দেওয়া এবং স্থানে স্থানে নদীতীর পাথর দিয়া বাঁধিয়া নদীর গতি নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। দেশের অরণ্যসমূহ ধীরে ধীরে সমূলে বিনষ্ট হইতেছে, ইহা অনাবৃষ্টির একটি প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। অরণ্যসমূহকে রক্ষা করাও কর্ত্তব্য। অরণ্যসমূহ রক্ষিত হইলে দেশে অনাবৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা অধিক হয় না। সুবৃষ্টি হইলে এবং নদনদীগুলি সংস্কৃত হইলে, উহারা ম্রিয়মাণ হইবে না। নদী হইতে খাল কাটিয়া জল আনা তখন সহজসাধ্য হইবে এবং বৈজ্ঞানিক জলসেচন এবং জল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকগণ অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতে পারিবে। কৃষিকার্য্যের স্থায়ী উন্নতি তখন সম্ভবপর হইবে।

(খ) পাট ইত্যাদি চাষের পরিমাণ-হ্রাস।

আমাদিগের কৃষকগণ যাহাতে বিদেশীর কারখানার জন্য উপকরণ-শস্য উৎপন্ন করিয়া দেশীয় খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ কমাইয়া না দেয় তাহার জন্য কৃষকদিগের মধ্যে উপকরণ-শস্য চাষের বিষময় ফল সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান আবশ্যক। কৃষকগণ

স্বভাবতই নিজেদের ব্যক্তিগত লাভকে কখনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে না ; যেখানে ব্যক্তিগত লাভ সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনের পরিপন্থী হয় সেখানে তাহারা নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। উপকরণ-শস্য চাষে তাহাদিগের কিছু নগদ টাকা আসিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাতে সমস্ত দেশবাসীর যে অমঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরন্তু, মানুষ কেবল অর্থ দিয়া বাঁচিতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে যদি অন্নসংস্থান না হয় তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জন বিফল হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে. গ্রামবাসিগণের অর্থ আছে, অথচ বাজারে চাউল নাই, যে, তাহারা অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে পারে। অতএব পাট ইত্যাদি চাষ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের নিজেদের যে স্বার্থসিদ্ধি হইবেই তাহাও নহে,—পাট বিক্রয় করিয়া একশত টাকা মজুত রাখা অপেক্ষা একমরাই ধান গৃহস্থের অধিক উপকারী। এই সমস্ত কথা কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক। তবেই উপকরণ-শস্য চাষ দেশে আর দেখা যাইবে না।

(গ) অবাধ শস্য-রপ্তানির প্রতিরোধ

তাহার পর খাদ্য-শস্য রপ্তানি বন্ধ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দেশে শস্যের ব্যবসায় যাহাতে বিদেশী বণিকদিগের হস্তগত না হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন এ গুরুতর কার্য্যে সফলতা লাভ করা সুকঠিন,—এবং শিক্ষিতদিগের ব্যক্তিগত ব্যবসায় দ্বারাও এ কার্য্য সাধিত হইবে না।

গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি যৌথভাবে চাউল গম ইত্যাদির ব্যবসায়ে আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া আশা করিতে পারেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে গ্রামে গ্রামে শস্য-আড়ৎ স্থাপন করিতে হইবে। বিভিন্ন গ্রামের শস্য-আড়ৎগুলি পরস্পরকে শস্য-আদান-প্রদান-ব্যাপারে সাহায্য করিবে, এবং জেলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে একটী কেন্দ্র-শস্য-আড়ৎ থাকিবে। জেলার বিচক্ষণ ব্যবসায়িগণ ঐ কেন্দ্র-আড়ৎ পরিচালনের ভার লইবেন, এবং ঐ জেলার কোন গ্রামে খাদ্য শস্যের মূল্য সাধারণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ গ্রামে শস্য-প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক জেলাতেই কেন্দ্র-শস্য-আড়ৎ থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে জেলায় জেলায় শস্যের আদান প্রদান চলিবে, কিন্তু কখনও বিদেশে রপ্তানির জন্য শস্যের ক্রয় বিক্রয় হইবে না।

ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যের অনুপযোগিতা

অনেকে বলেন বাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, অথবা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিলে কুফল অবশ্যম্ভাবী ; বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং প্রশস্ত পন্থা স্বভাবতঃই অনুসরণ করে এবং ঐ পথ যদি রুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে উহা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। জার্ম্মাণী এবং আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের বৈষয়িক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি কেবলমাত্র তাহা-

দিগের স্বাভাবিক গতির উপর নির্ভর করে না। জার্ম্মাণী এবং আমেরিকায় রাষ্ট্র, ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে আপনার নিজের শক্তির দ্বারা রক্ষা ও পালন করিয়াছিল, এই কারণে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সেখানে এত উন্নতি। বাস্তবিক ব্যবসা ও বাণিজ্যকে অবাধে আপনাদের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে অনেক সময়েই শ্রেয় নহে। ভারতবর্ষে ব্যবসার ক্ষেত্রে রক্ষণ ও পালননীতি অবলম্বনের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহুকাল হইতে তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে ; কিন্তু বাণিজ্য-ক্ষেত্রে রক্ষণনীতি অবলম্বন সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা হয় নাই। খাদ্য-শস্যের অবাধ রপ্তানি কোন দেশেরই পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিজাত সামগ্রীর বিনিময়ে ভারতবর্ষ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার আমদানি করিয়া থাকে। যদি দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় তাহা হইলে তাহার বিনিময়ে স্বদেশের শস্য রপ্তানি করিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের আমদানি দ্রব্যসমূহের তালিকা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে. ভারতবর্ষ বাণিজ্য অথবা দ্রব্যবিনিময়ে লাভ করা দূরে থাক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যে সমস্ত দ্রব্যের অভাবে কোন দেশ অত্যাবশ্যক আহার্য্য পরিচ্ছদাদি হইতে বঞ্চিত হয়, সে সকল দ্রব্যের রপ্তানি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাই আহারের বিনিময়ে আমদানি হউক না কেন, বিদেশ হইতে ত জীবন ফিরিয়া আসিবে না।

আবশ্যকীয় আহার্য্যাদি রপ্তানি করিয়া যদি সমাজ অন্নকষ্টে জর্জ্জরিত এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে তাহা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত ধনবৃদ্ধি হইলেও সে ধন কে ভোগ করিবে ?

বাণিজ্যের ডাকিনীমূর্ত্তি

এজন্য এক্ষেত্রে বাণিজ্য ধনবৃদ্ধির কারণ হইলেও ডাকিনীর মত প্রলোভন দেখাইয়া একদিকে যেমন সমাজকে একবারে মোহান্ধ করিয়া ফেলে অপর দিকে পলে পলে তাহার রক্ত শোষণ করিয়া লয় ; অথচ সমাজ তাহা অনুভব করিতে পারে না। বাণিজ্যের রূপ মাতৃমূর্ত্তি, দানবীর রূপ নহে। বাণিজ্য সমাজ-শিশুকে তাহার স্তন্যপিযূষ পান করাইয়া, আপনার বক্ষে সতত ধারণ করিয়া সস্নেহে পোষণ করে। বাণিজ্য রক্ত দান করিয়া পুষ্ট করে, শোষণ করিয়া হত্যা করে না। আমরা বাণিজ্যের মাতৃমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ডাকিনীর রূপকে সমাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এবং পলে পলে ঐ ডাকিনীর কুহকে পড়িয়া আপনাদিগের জীবন বলিপ্রদান করিতেছি।

বাণিজ্যক্ষেত্রে অপরিণামদর্শিতা

যতদিন না আমাদের এই মোহ দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে বহির্বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু অতীত ইতিহাসে ভারতীয় বাণিজ্যসামগ্রী নিত্য-প্রয়োজনীয় শস্যাদি ছিল না। কার্পাস, রেশম কাপড়, মস্‌লা, মস্‌লিন্, হীরক প্রভৃতি তখন বিদেশে রপ্তানি হইত। অতীতকালে

নিজ অন্ন পরকে বিলাইয়া দিয়া ভারত ক্ষুধার তীব্র যাতনা অনুভব করিত না; ভারতবাসিগণ নিজেদের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া উদ্বৃত্ত ভোগ বিলাসের সামগ্রী বিদেশে প্রেরণ করিত এবং তাহার বিনিময়ে প্রত্যেক বৎসর অজস্র পরিমাণে স্বর্ণ আমদানি করিত।

সর্ব্বপ্রথমে কৃষিশিল্প ব্যবসায় দ্বারা আভ্যন্তরিক অভাব মোচন; তাহার পর বিলাসভোগ এবং অবশেষে বাণিজ্যের দ্বারা উদ্বৃত্ত বিলাস-সামগ্রীর বিনিময়ে স্বর্ণাদি ধাতুর আমদানি করিয়া ধন সঞ্চয়ের উপায় করা—ইহাই পূর্ব্বের ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে ভারতীয় বাণিজ্য বিপরীত পন্থা অনুসন্ধান করিতেছে। স্বদেশের নিত্য অভাব মোচিত না হইয়া ভারতীয় শস্যাদি বিদেশে প্রেরিত হইতেছে এবং তাহার বিনিময়ে বিলাস-সামগ্রী অত্যধিক পরিমাণে আমদানি হইতেছে। বিলাস-সামগ্রীর আমদানি এবং খাদ্যশস্যের রপ্তানি একদিকে অন্নকষ্ট অপরদিকে শ্রমজীবীগণের জীবিকার্জ্জনের জন্য বিদেশ গমনের কারণ হইয়াছে। অসংখ্য ভারতবাসী বৎসর বৎসর আফ্রিকা আমেরিকা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জীবিকার সন্ধানে যাত্রা করিতেছে। অন্নাভাবে রোগাধিক্য হেতু সমাজের একদিকে শক্তিহ্রাস এবং বিদেশ যাত্রা হেতু অপরদিকে শক্তিনাশ হইতে চলিয়াছে। এরূপে সমাজ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা যে বিশেষ মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার ফল যে ভারতবর্ষ এক্ষণে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিতেছে তাহা বলিতে হইবে না।

প্রতিকার

ব্যবসা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে এক্ষণে গভীর চিন্তা, ধীর এবং সংযত-ভাবে অভাব বিশ্লেষণ এবং পরিণামদর্শিতার সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আর প্রয়োজন হইয়াছে,—কেবল অভাববোধ নহে, অভাব-মোচনের জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, সমবেত উদ্যোগ, অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম।

নবম অধ্যায়

পল্লীসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা

সমাজ-সেবা-প্রণালী

বাংলা দেশে এক্ষণে পল্লীগ্রাম-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীগ্রামের দুঃখ দারিদ্র্য এবং অসংখ্য অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে আমাদের সমাজ বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বহুসংখ্যক যুবক নানা স্থানে বিভিন্ন উপায়ে পল্লীবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের নীরব সাধনা আমাদের জাতীয় জীবনকে কি পরিমাণে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে, তাহা আমাদের দেশের খুব কম লোকই ভাবিয়া দেখেন। দেশে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কার্য্যপ্রণালীর বিভিন্নতাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, সমাজের সমস্ত শক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত না হইলে এখন দেশে কোন কার্য্যই সফল হইবে না। দেশের শক্তি অল্প, এমত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেশের মঙ্গলবিধান করিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে, একটি মাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ণয় করিয়া সেই পন্থাতেই সমাজের

সমস্ত শক্তিকে চালনা করিতে হইবে তবেই গন্তব্য স্থানে শীঘ্রই পৌঁছান যাইবে।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে আয়নায়" বলিয়া একটী মাত্র পথ অনুসরণের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের কথা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। কিন্তু আমাদের সমাজ এখনও এরূপ একটি ভাবে বিভোর হয় নাই, উহার গঠনশক্তি এরূপ বৃদ্ধি পায় নাই, যাহাতে আমাদের সমগ্র চিন্তা ভাবনা কেবলমাত্র একটি সুমহান্ আদর্শ স্ফুরণের ইন্ধন যোগাইতে পারে, এবং সমস্ত কার্য্যপ্রণালী একই পবিত্র হোমানল-শিখা প্রদীপ্ত রাখিবার জন্য উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। এখন আকাঙ্ক্ষার প্রথম জাগরণ, এখন কর্ম্মপ্রণালী ও কর্ম্মশক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের অধিক প্রয়োজন নাই। কর্ম্মপ্রণালী যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে, কর্ম্মশক্তিও অতি ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে লজ্জা জন্মিবার কোন কারণ নাই। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সমগ্র সমাজব্যাপী কর্ম্মশক্তির যাহাতে উদ্রেক হয়, বিচিত্র অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহাতে সমাজের আকাঙ্ক্ষা বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহাই এখন দেখিবার বিষয়। সমস্ত কর্ম্মপ্রণালী যে একমুখী বা পরস্পর সম্বদ্ধ হয় নাই, তাহাতে আমাদের নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই।

কিন্তু এখন হইতেই আমাদিগকে ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে হইবে। বিভিন্ন স্থানের কর্ম্মপ্রণালী যাহাতে এক বিপুল অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে এবং এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে শক্তিসমূহের

মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত না হইলে আমরা শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখি না, ফলেরও বিশিষ্ট পরিচয় পাই না। কোন স্থানবিশেষে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে একটী মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিভিন্ন শক্তিকে সেই আদর্শ অনুসারে চালনা করিতে হইবে; এইরূপে সমস্ত শক্তি এক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে, আমরা শীঘ্রই শক্তির পরিচয় পাইব। আমাদের দেশে নানা স্থানে ক্ষুধিত এবং আতুরদিগের সেবা, দীন দুঃখীর প্রতিপালন, অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষাদান প্রভৃতি যে-সকল কার্য্য নিত্য নিয়মমত নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার ফলে আমরা আমাদিগের স্বকীয় শক্তি ধীরে ধীরে অনুভব করিতেছি, আমাদের আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস এবং সমাজ-সেবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ইহাতে যে সমাজের বিশেষ পরিমাণে স্থায়ী উন্নতি সাধিত হয় নাই তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইজন্য আমাদের কর্ম্মীগণ যাহাতে সমাজ-শক্তির প্রয়োগের সুফল শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে সেই উপায়ই উদ্ভাবন করিতে হইবে।

পল্লী-জীবনের অবনতি

আমাদের সমাজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে হইলে পল্লীগ্রামে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, কারণ আমাদের জীবন পল্লীগ্রাম লইয়াই। দেশের শতকরা ৯০ জন এখনও পল্লীগ্রামে বাস করিতেছে, দুঃখের

বিষয় তবুও আমাদের শিক্ষা বা সামাজিক যাহা কিছু আন্দোলন হইয়াছে তাহা কয়েকটী সহরে আবদ্ধ রহিয়াছে। দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আপনাদের ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়াছেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন তাঁহারা স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় হারাইয়া ক্রমশঃ হীনতেজ হইয়া পড়িতেছেন, অপরদিকে পল্লী-বাসীরাও তাঁহাদের সাহচর্য্য এবং সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছে। কয়েকটি সহর খুব স্ফীত হইয়া উঠিতেছে,—সহরের স্ফীতদেহ স্বাস্থ্য নহে ব্যাধিরই চিহ্ন। সহরগুলি স্বাধীন ব্যবসায়ের বা জীবিকানির্ব্বাহের কর্ম্মভূমি না হইয়া চাকরীস্থান হইয়াছে। চাকরীর সংখ্যা বা মাহিয়ানা বৃদ্ধি পাইতেছে না, অথচ দেশময় মূল্যাধিক্য, বিশেষতঃ সহরের আব-শ্যকীয় দ্রব্য সমূহের মূল্য বিভিন্ন কারণে এত অধিক হইয়াছে যে, সংসারের ব্যয়-সঙ্কুলান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত-দিগের আয় কমিয়া গিয়াছে অথচ মাহিয়ানা বৃদ্ধির বিশেষ আশা নাই। উপরন্তু তাঁহাদিগের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের অবস্থা ক্রমশঃ বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের উচ্চজাতি সমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে তাহার কারণ মধ্যবিত্তেরা দারিদ্র্য হেতু আধুনিক চালচলন রক্ষা করিতে পারি-তেছেন না। অথচ তাঁহাদিগকে গ্রামের স্বাধীন জীবিকা এবং নির্দ্দিষ্ট আয় ত্যাগ করিয়া সহরেই যাইতে হইবে। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান এবং সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন

সুতরাং পল্লীজীবনে বিদ্যাচর্চ্চা, কথকতা, যাত্রা, সঙ্কীর্ত্তন, প্রভৃতির আদর কমিয়া গিয়াছে ; গ্রামে দলাদলির ভাব প্রবল হইতেছে, গ্রামের মণ্ডল মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিতে পারিতেছে না। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সহকারিতার অভাব দেখা গিয়াছে। গ্রামে জল সরবরাহ বন্ধ হইতেছে কিন্তু ইহার প্রতিকার হইতেছে না। গ্রামের পথঘাট অমার্জ্জিত এবং অপরিষ্কৃত, পুষ্করিণী সমূহ অসংস্কৃত। গ্রামবাসীগণ স্বাবলম্বন হারাইতেছে। গ্রাম বনজঙ্গলময় হইতেছে, বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে না। ম্যালেরিয়া বসন্ত বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে, গ্রাম্য শিল্পসমূহ ইউরোপের কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগিতায় অপারগ হইয়া বিধ্বস্ত হইতেছে। গ্রামের যাহা কিছু মূলধন তাহার দ্বারা বিদেশে শস্যরপ্তানির সুবিধা হইয়াছে। শস্য-ব্যবসায় ক্রমশঃ বিদেশী বণিকদিগের হস্তগত হওয়ায় গ্রামে অন্নাভাব থাকিলেও শস্য রপ্তানি হইতেছে।

পল্লীগ্রামের বৈষয়িক জীবন এখন কেবলমাত্র বিদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতেছে, পল্লীগ্রামের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক জীবন আর নাই। কোন্ দূর শতাব্দী হইতে পল্লীগ্রামের উপর দিয়া যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল তাহা এখন অবরুদ্ধ হইয়াছে, যুগযুগান্তকালের সমস্ত চিন্তা এবং সাধনা এখন লুপ্তপ্রায়, জাতীয় জীবন এখন কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে, অতীতকালের সাধনা হইতে বিচ্যুত হইয়া বিদেশী সভ্যতার জন্মস্থানে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রাণ যেখানে বিকাশ লাভ

করিয়াছে তাহা এখন পরিত্যক্ত। পল্লীগ্রামের দেউল এখন ভগ্ন, অসংস্কৃত এবং দেবতাশূন্য। পল্লীদেবতার আরাধনার সহিত আমাদের পল্লীগতপ্রাণ জাতীয় সাধনারও লোপ হইতেছে।

পল্লী-সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা

সমাজের এখন পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভগ্ন দেউল সংস্কৃত করিয়া পুনরায় সেখানে দেবতা বসাইতে হইবে। জাতীয় সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সমূহের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এ তীর্থের রক্ষক এবং পূজারী কাঁহারা হইবেন? যাঁহারা দেবতার কবচ পরিধান করিয়া মস্তকে দারিদ্র্য-কিরীট ধারণ করিয়া জাতীয় সাধনা জাগ্রত করিবার জন্য নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে পল্লীবাসী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিবেন; আপনাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তার যন্ত্রী অনুভব করিয়া যাঁহাদের শক্তি অদম্য এবং অসীম হইবে এবং যাঁহাদের প্রত্যেক সেবাকার্য্য ও অনুষ্ঠান দীনবন্ধুর চরণপূজা রূপে উপলব্ধি হইবে; অনন্ত কর্ম্মস্রোতের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিবেন অথচ কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে যাঁহাদের অনন্তের নিবিড় উপলব্ধির কোন ব্যাঘাত হইবে না; একদিকে যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ এবং অপর দিকে কর্ম্মনিষ্ঠ, একদিকে জ্ঞানী অপরদিকে বিষয়াভিজ্ঞ অক্লান্ত কর্ম্মী,—তাঁহারাই আমাদের পল্লীগ্রামের জাতির অন্তরতম প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন।

উদ্দেশ্য

সমাজের শ্রমজীবি-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইহাঁরা কোন্ কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিবেন তাহাই এখন আলোচ্য। কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি হয়। পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীগণকে স্বাবলম্বন শিখাইতে হইবে। নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীগণ পরস্পরের খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব পূরণ করিবে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কৃষিব্যবসায়ের এবং বাণিজ্যের ধুরন্ধর এবং শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। বাণিজ্য ব্যবসায় যাহাতে পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনের জন্যই প্রবর্ত্তিত হয় তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন, এবং শিক্ষা যাহাতে পল্লীবাসীগণের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হয়, তাহারও উপায় বিধান করিবেন। গ্রাম্য শিল্পকলা, সাহিত্য, আচার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদ এবং ক্রিয়া কর্ম্ম যাহাতে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের চিন্তাজীবন এরূপে স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারিবে। পল্লীগ্রামের সমস্ত অভাব পল্লীগ্রামবাসীদের দ্বারাই পূরণ করিতে হইবে। একদিকে ইহাতে যেমন পল্লীবাসীদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে তাহারা নিজ নিজ অভাব মোচন করিয়া আনন্দ এবং সুখলাভ করিতে পারিবে। বিশ্বজগতের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান উহাদের উপঢৌকন লইয়া পল্লীবাসীর নিকট উপস্থিত হইবে। দেশের যে সমস্ত ধনসম্পদ এবং বিদ্যাগৌরব এখন কেবল মাত্র সহরেই কেন্দ্রীভূত

হইতেছে, তাহা এক্ষণে সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত হইবে। ইহার ফলে সমগ্র সমাজের বিদ্যোন্নতি এবং আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে।

কর্ম্মকেন্দ্র—পল্লী-ভাণ্ডার

এ কার্য্য সফল করিবার জন্য ধীর আয়োজন চাই। ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতে ধীরে ধীরে বৃহৎ অনুষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। কি উপায়ে গ্রামে গ্রামে এরূপ কার্য্যের সূচনা হইবে তাহা এক্ষণে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই প্রকার কার্য্যারম্ভ কিয়ৎ পরিমাণে দেখা গিয়াছে।

প্রথমে পল্লীবাসিগণের দৈনন্দিন অভাব মোচন করিবার জন্য গ্রামে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। সমস্ত গ্রামবাসী অথবা গ্রামের কোন হিতৈষী ব্যক্তি কিছু টাকা তুলিয়া গ্রামে পঞ্চায়ৎগণের হস্তে উহা অর্পণ করিবে। পঞ্চায়ৎগণ ঐ অর্থ হইয়া বস্ত্র, চিনি, লবণ, ঘৃত প্রভৃতি নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিবে। যেখানে যে দ্রব্য অতি সুবিধা দরে পাওয়া যাইবে সেই স্থান হইতে উহা ক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে। দ্রব্যসমূহ পাইকারীদরে বিক্রয় করা হইবে। গ্রামবাসীদিগের নিজেদেরই দোকান বলিয়া তাহারা সকলেই সময়ে সময়ে উহার তত্ত্বাবধান করিবে। দোকানদারেরা সচরাচর খুচরা দরে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে লাভ করিয়া থাকে সেই লাভ দোকানের মূলধনে পরিণত হইবে, শেষে গ্রামবাসী খরিদদারগণের মধ্যে উহা বিতরিত হইবে।

ভাণ্ডার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিল্প-কৃষি-কার্য্য

এই ভাণ্ডারে বিক্রয় খুব অধিক হইলে পঞ্চায়ৎগণ শিল্পী নিযুক্ত করিয়া দ্রব্য প্রস্তুতকরণের ভারও গ্রহণ করিবে। তখন অন্য কোন সহর বা বাজার হইতে দ্রব্য আমদানী করিতে হইবে না, অথচ গ্রাম্য শিল্পসমূহেরও উৎসাহ দেওয়া হইবে। গ্রামের তাঁতী ও কামার গ্রামের ভাণ্ডারেই তাহাদিগের নির্ম্মিত দ্রব্য পাঠাইয়া দিবে এবং ভাণ্ডার হইতে উহাদিগের আহার্য্য ও বস্ত্রাদি পাইবে. গ্রামের কৃষকগণ ভাণ্ডার হইতে মূলধন কর্জ্জ লইবে। ঐ মূলধনে তাহাদের কৃষিকার্য্য চলিতে থাকিবে। কৃষকগণ সমবেত হইয়া কর্জ্জ লইবে, প্রত্যেক কৃষক অন্য কৃষকের কর্জ্জের জন্য ভাণ্ডারের নিকট দায়ী থাকিবে। ইহার ফলে সকলেই সকলের কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবে, ভাণ্ডার হইতে কৃষক যে মূলধন লইবে তাহার যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় উহা প্রত্যেককেই দেখিতে হইবে। একজন কৃষকের জন্য অপর সমস্ত কৃষক দায়ী থাকে বলিয়া মূলধন নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না, ইহার ফলে কর্জ্জের সুদ খুব অল্প হইবে।

ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে কর্জ্জ দিবার জন্য এই প্রকার অনেকগুলি ঋণ দান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০৪ সনে এদেশে ঋণ-দান সমিতির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত তালিকা পড়িলে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি আমরা বুঝিতে পারিব,—

১। বৎসর	২। সমবায় সমিতির সংখ্যা	৩। সভ্য
ক। ১৯০৬	৮৪৬	৯৯,৩৪৩
খ। ১৯১৪	১২,৩২৪	৫৭৩,৫৩৬

অধিকাংশ সমবায়-সমিতিগুলিই ঋণ-দান-সমিতি। জার্ম্মানীতে স্বদেশবাসী দরিদ্র কৃষকগণের দারিদ্র্য মোচনের উদ্দেশ্যে রাইফেজেন যে যৌথ ঋণ দান পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন উহাই এদেশে সমবায়-আন্দোলনের সূচনাকালে গভর্ণমেণ্ট অনুকরণ করিয়াছিলেন। রাইফেজেনের পদ্ধতি গভর্ণমেণ্ট এখন অন্ধভাবে অনুকরণ করিতেছেন। এই কারণে ঋণ দান-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষকগণ ঋণ গ্রহণে সুবিধা পাইলেই যে উন্নতি লাভ করিবে তাহা নহে। তাহাদের কৃষিকার্য্যের যদি উন্নতি না হয় এবং তাহারা যদি উৎপন্ন শস্য যথোচিত মূল্যে বিক্রয় না করিতে পারে তাহা হইলে কৃষক-গণের স্থায়ী উন্নতি হওয়া অসম্ভব। একারণে জার্ম্মানীতে রাইফেজেন কৃষকদিগকে কর্জ্জগ্রহণের সুবিধা করিয়া দিয়াই সন্তুষ্ট না থাকিয়া উৎকৃষ্ট শস্যের বীজ এবং শস্যোৎপাদনের জন্য সার এবং যন্ত্রাদি সংগ্রহ এবং শস্যবিক্রয়েরও সুবিধা দান করিয়াছিলেন। রাইফেজেনের পর ডাক্তার হাস নানা প্রকার যৌথ-ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। শুধু জার্ম্মানীতে নহে, ইউরোপের অন্য প্রদেশেও যৌথ-ঋণদানের সহিত যৌথ-ক্রয়েরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইবে :—

	যৌথ-ঋণদান	যৌথ-ক্রয়	অন্যপ্রকার যৌথ দ্রব্যোৎপাদন
১। জার্ম্মানী	১৮৫০	১৮৬০	
২। ডেনমার্ক	—	১৮৬৬	
৩। আয়ারল্যাণ্ড	১৮৯৫	১৮৯০	
৪। ইংলণ্ড	—	১৯০০	
৫। সুইজারল্যাণ্ড	১৮৯০	১৮৮৬	
৬। ফ্রান্স	১৮৮৫	১৮৮৪	
৭। বেলজিয়াম	১৮৯২	১৮৯০	
৮। ইতালী	১৮৬৫	১৮৮৪	

ইউরোপের সমস্ত পদেশেই সমবায়-সমিতি কৃষকগণকে যেরূপ ঋণ গ্রহণের সুবিধা প্রদান করিয়াছে, সেইরূপ তাহাদের জন্য পাইকারী দরে বীজ সার এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়া কৃষিকার্য্যের বিপুল উন্নতির সহায় হইয়াছে। যে সমস্ত যন্ত্রের মূল্য খুব অধিক সেগুলি কৃষকেরা ক্রয় করিতে পারে না; কিন্তু কোন এক গ্রামের সমস্ত কৃষক সমবেত হইয়া ঐগুলি ক্রয় করিতে পারে এবং পরে সময়মত কৃষকেরাই আবশ্যকমত ব্যবহার করিতে পারে। আমাদের দেশে ঋণ-দান সমিতিগুলির দ্বারা যে কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হইতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু কৃষকগণ কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করিয়া কি ফল লাভ করিবে? মহাজনদিগের নির্য্যাতন এবং অত্যাচার হইতে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিবে সত্য,

কিন্তু তাহারা এখনও ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। উপরন্তু শস্যোৎপাদন কার্য্যে কোন উন্নতি না হওয়াতে এবং অধিকাংশ স্থলে ব্যাপারী এবং পাইকারগণের নিকট অতি সুলভ দরে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়াতে তাহাদের দারিদ্র্যের অবসান হইবে না। আমাদের দেশে শস্যোৎপাদনের জন্য বীজ, সার প্রভৃতি কৃষকেরা প্রায়ই ক্রয় করে না; উপযুক্ত বীজ এবং সারের ব্যবহারের উপকারিতা কৃষকেরা এখনও বুঝে নাই। তাহারা এই সমস্ত দ্রব্য অজ্ঞ অথবা প্রবঞ্চক দোকানদারগণের নিকট হইতে ক্রয় করাতে তাহাদের পরিশ্রম সফল হয় না। অধিকন্তু শস্যোৎপাদন করিয়া তাহারা যে মূল্যে শস্য বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে শস্যের বাজার-মূল্য এবং যে মূল্যে পাইকারগণ শস্য বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়া থাকে উহা বুঝা যাইবে। অধিকাংশ স্থলেই কৃষকেরা দাদন পাইয়া থাকে, এজন্য উহাদের ক্ষতি আরো বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

শস্য (একমণ)	দাদন	বাজার-মূল্য
পাট	৫৷৷০	৯৲
বুট	৫৲	৭৲
তিসি	১৷৷০	২৷৷০

সুতরাং সমবেত প্রণালীতে কেবলমাত্র কর্জ্জ গ্রহণ করিলেই যে কৃষকদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে তাহা নহে, শস্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত না থাকাতে কৃষকদিগের অবস্থা কখনই উন্নত হইবে

না। গভর্ণমেণ্ট এ কথা না বুঝিলে সমবায়-আন্দোলনের দ্বারা আমাদের কৃষকগণের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র ঋণদানের সুযোগ প্রদান করিলে নির্ধনতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দেশে এখন ধনবৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, কর্জ্জগ্রহণের সুবিধা সৃষ্টি করিলেই কৃষকদিগের অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হইবে না, এ কথা মনে রাখা আবশ্যক।

যৌথ-ক্রয়-বিক্রয়

আমরা যে প্রকার সমবায় প্রতিষ্ঠার লক্ষণে আলোচনা করিতেছি উহাতে সমবায়-ভাণ্ডার কেবলমাত্র কৃষকগণকে কর্জ্জ দান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না। ভাণ্ডার কৃষকগণকে বীজ যন্ত্র সারাদি দান করিবে এবং উৎপন্ন শস্য বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিবে।

পল্লীগ্রামের শিক্ষা ও জীবিকা

গ্রামের সমবায়-পরিষৎ পল্লীবাসীগণের শিক্ষার ভারও করিবেন। নৈশবিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীগণকে আধুনিক ব্যবসায়-বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারের সহিত পরিচিত করাইবেন। বিশেষতঃ যে কৃষি এবং ব্যবসায়-বিজ্ঞানের দ্বারা পল্লীগ্রামে অর্থাগমের উপায় হইবে, উহাদের আলোচনা হইবে। পল্লী-পরিষৎ কৃষি-উদ্যানে নানাবিধ শস্য লইয়া বিবিধ সার এবং যন্ত্রাদির প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিবে। প্রদর্শনী খুলিয়া নূতন সার অথবা নূতন যন্ত্রের প্রচলনের জন্য উৎসাহ প্রদান

করিবে। এরূপে নূতন নূতন শস্য-সার এবং যন্ত্র কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। সমবায়-ভাণ্ডারের দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়, কর্জ্জদান অথবা শস্য-ব্যবসায়ে যাহা লাভ হইবে, তাহা হইতেই উক্ত অনুষ্ঠান-গুলির ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। অধিকন্তু বৈষয়িক অনুষ্ঠান ব্যতীত নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিও পল্লী-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

বিজ্ঞান-প্রচার ও নূতন ব্যবসায় প্রবর্ত্তন

এরূপে গ্রামবাসীরাই গ্রামের শিক্ষা, দীক্ষা, বৈষয়িক এবং নৈতিক উন্নতির ভার গ্রহণ করিলে এক একটি গ্রাম স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিবে। গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কত প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যে আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া জগতের সম্মুখে তাঁহাদের প্রতিভা জ্ঞাপন করিবেন। গ্রামের কৃষি বিদ্যালয়ে বীজ ও সার লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে একজন কৃষক হয়ত কোন নূতন আবিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য্য সহজ করিয়া দিবে। কোন শিল্পী আপনার সামান্য কুটিরে বসিয়া অভিনব যন্ত্র অথবা কর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কার করিবে। ভদ্রসমাজের মধ্যে যাঁহারা এক্ষণে চাকুরীর আশায় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিতেছেন তাঁহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিবার আর কোন কারণ পাইবেন না। গ্রামেই এক্ষণে বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে, নূতন নূতন ব্যবসায়ও প্রবর্ত্তিত হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কলিকাতায় বসিয়াই বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতেছেন, দেশের

মাটী হইতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞানচর্চ্চা একেবারেই বিচ্ছিন্ন। কাজেই একদিকে যেমন তাঁহাদিগের গবেষণা দেশের বিশেষ উপকারে লাগিতেছে না, অপরদিকে দেশবাসীরাও তাঁহাদিগকে আপনাদের করিয়া লইতে পারিতেছে না, তাঁহারা ইহাদের নিকট অপরিচিতই থাকিয়া যাইতেছেন। বিজ্ঞান যখন পল্লীতে পল্লীতে, কুটিরে কুটিরে আলোচিত হইবে, যখন প্রত্যেক গ্রামই তাহার বিজ্ঞানাগারের জন্য গৌরব অনুভব করিবে, যখন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কৃষক এবং শ্রমজীবিগণের নিকট অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়রূপে পরিণত হইবে, তখন উহা মস্তিষ্কের একটা নীরস ধারণা-মাত্র না থাকিয়া জীবন্ত সত্যরূপে গৃহীত হইবে, দৈনন্দিন জীবনের সহিত উহার নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিজ্ঞানকে আপনার করিয়া লইয়া সমাজ বৈজ্ঞানিকগণকে তখন প্রকৃত সম্মান করিতে শিখিবে।

মধ্যবিত্তদিগের অন্ন-সংস্থান

বৈজ্ঞানিকগণ হাতে কলমে কাজ করিয়া দেশের প্রাকৃতিক শক্তি এবং দ্রব্যাদির যথোচিত ব্যবহার করিতে শিখিবেন। এরূপে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দেশের গাছ-গাছড়া ফুল ফল বীজ অথবা জন্তুর রোম চামড়া প্রভৃতি হইতে বিবিধ দ্রব্যের উপাদান প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে বনজঙ্গলে কত প্রকার উপাদান-সামগ্রী যে নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈজ্ঞানিকগণ পল্লীতে পল্লীতে তাঁহাদের

বিজ্ঞানাগারে এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিবেন। তাঁহাদের পরীক্ষাই নূতন ব্যবসায় প্রবর্ত্তনের সহায় হইবে। কেবলমাত্র নূতন শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা নহে, বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কৃষি এবং শিল্প-সমূহেরও উন্নতি সাধিত হইবে। অভিনব যন্ত্রাদি এবং সহজ কর্ম্মপ্রণালীর প্রচলন হইবে, ইহাতে কৃষক এবং শিল্পীগণের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইবে। বিজ্ঞান এরূপে গ্রামে গ্রামে কৃষক এবং শিল্পীগণের প্রয়োজনে লাগিয়া উহাদের অর্থাগমের সহায় হইবে. এবং মধ্যবিত্তদিগের জন্য নূতন নূতন শিল্প-ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথ খুলিয়া দিয়া চাকরী অপেক্ষা শ্রেয়স্কর উপায়ে অন্ন-সংস্থানের সহায় হইবে। গ্রামে পল্লী-পরিষদের অধীনে এবং বৈজ্ঞানিকগণের তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা সমবায়-প্রণালীতে পরিচালিত হইবে। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের উপাদান প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি না হইয়া কারখানায় দ্রব্য-প্রস্তুত করণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে একদিকে যেরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে, অপরদিকে গ্রামে বিদেশ হইতে নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইবে। দেশে নূতন নূতন ধনবৃদ্ধির উপায় সৃষ্ট হইবে, সকলেই কৃষিকার্য্য অথবা চাকুরীর জন্য নির্ভর করিয়া থাকিবে না।

পল্লী-পরিষদের কর্ম্ম

ধন-বৃদ্ধির সহিত অর্থোৎপাদন-প্রণালীরও উন্নতি হইবে। শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্য—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমবায়-প্রণালী অনুসৃত

হইবে। ইহার ফলে সমাজের মূলধন এবং শ্রমজীবি শক্তির শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে। কৃষক শিল্পী এবং শ্রমজীবীগণ সমবায়-পরিষদের অধীনে ও নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিবে এবং পরস্পর সহকারিতার উপকার বুঝিবে। এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁতি, কর্ম্মকার. প্রভৃতি সমগ্র গ্রামবাসিগণের অভাব মোচন করিবার জন্য তাহাদিগের জাতিগত ব্যবসায় অধ্যবসায়ের সহিত অনুসরণ করিতেছে. এবং পল্লী-গোষ্ঠীর নিকট হইতে পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি হইতে শস্য গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অনুগৃহীত বোধ করিতেছে ; এখনও পল্লীগোষ্ঠীতে কৃষকগণ শস্যোৎপাদন কার্য্যে বিভিন্ন প্রকার সমবেত কার্য্যকরণ-প্রণালীর অনুসরণ করিতেছে ; বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজা, সংকীর্ত্তনাদি গ্রামবাসীদিগের সমবেত পরিশ্রম ব্যয় এবং উৎসাহের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের মণ্ডলগণের বিচারকার্য্য শান্তিরক্ষা সমবেত-কার্য্যকরণে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি পল্লীবাসিগণের আত্মনির্ভরতা এবং আত্মশক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক গোষ্ঠী-প্রভাবের আধিপত্য এবং গোষ্ঠীর উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একতা ও সমবেত কার্য্যানুষ্ঠান আমাদের সমাজের একটি প্রধান বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য সমাজ আধুনিক কালে যে সমাজতন্ত্রবাদ এবং সমবায় বিজ্ঞান প্রচার করিতেছে তাহা আমাদের সমাজের নিকট নূতন হইবে না। কিন্তু আদর্শের দিক হইতে নূতন না হইলেও পাশ্চাত্য জগতে পল্লীগ্রামগুলি সমবায়-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়াছে তাহা আমাদের পল্লীসমাজের নিকট বিশেষ আশা এবং উৎসাহের কথা। পল্লীবাসিগণ পল্লী-পরিষৎ

স্থাপন করিয়া গ্রামের সমস্ত অভাব সমবেতভাবে মোচন করিতে অগ্রসর হইবে। মণ্ডল অথবা পঞ্চায়ৎগণের প্রভাব কেবলমাত্র বিচার এবং শান্তিরক্ষা-কার্য্যে আবদ্ধ না থাকিয়া পল্লীবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনে লক্ষিত হইবে। পল্লী-পরিষৎ সমস্ত পল্লীবাসিগণের প্রতিনিধি স্বরূপ কৃষি শিল্প ব্যবসায় শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি নিয়-ন্ত্রিত করিবে।

(ক) গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি জীবননির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করণ;

(খ) স্বাস্থ্যরক্ষা;

(গ) শিক্ষা (কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়);

(ঘ) ধর্ম্ম; যাত্রা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন, পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি;

(ঙ) বিচার, গ্রাম্যবিবাদ সমূহের নিষ্পত্তি;

(চ) বনজঙ্গল পরিষ্কার এবং জল সরবরাহ;

(ছ) মনুষ্য এবং গোমহিষাদির জীবন বিমা;

(জ) জলসেচন, বাঁধ রক্ষা ও নির্ম্মাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদ নদী সংস্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ;

(ঝ) ক্রয়বিক্রয়, বাণিজ্য; শস্য-গোলা রক্ষা, মূলধন সংগ্রহ;

(ঞ) আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়া, ব্যায়াম;

প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই গ্রামের পল্লী-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

দেশব্যাপী সমবায়-সমাজ গ্রামে গ্রামে যখন এইরূপ পল্লী-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত করিবে, তখন প্রত্যেকেরই পক্ষে আপনার উদ্দেশ্য সাধন

আরো সহজ হইবে। বিভিন্ন স্থানের পল্লী পরিষৎগুলি ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা, নদ নদী সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিবে, এবং ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া সকলে একই ভাবে অনু-প্রাণিত হইয়া এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ সমগ্র-দেশব্যাপী এক বিপুল সমবায়-সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইবে। ইহার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিয়া শ্রমজীবিগণ এক নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাদের কর্ম্ম-শক্তি বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া তাহারা স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবে। এই প্রকারে পল্লীসমাজ প্রত্যেক বিষয়েই আত্মনির্ভর হইয়া এক নবযুগের উপাদান হইবে।

নবযুগের নূতন কর্ম্মী

দেশের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের হাতেই এই বিপুল কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের ভাবুকতা আছে, তাঁহারা এই কার্য্যকে স্বপ্নের অগোচর না ভাবিয়া বাস্তবজীবনে নিজ নিজ কর্ম্ম-শক্তির দ্বারা সফল করিবার জন্য প্রয়াসী হইবেন; তাঁহাদের অধ্যবসায় আছে, তাঁহারা ক্ষুদ্র আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের বিপুল উন্নতির বীজ লক্ষ্য করিবেন, অন্যান্য বাধাবিঘ্ন এবং সফলতার অসম্পূর্ণতার মধ্যেও তাঁহারা নিরাশ না হইয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন। এখন চাই তাঁহাদের মধ্যে ব্যাকুলতা,

পরদুঃখকাতরতা, অনশনক্লিষ্ট অসংখ্য দেশবাসিগণের ক্ষুধায় ক্ষুধার তীব্র তাড়না অনুভব করা, কর্দ্দমময় দূষিত জল যাহারা পান করিতেছে তাহাদের দারুণ পিপাসায় তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া ; আর চাই কর্ম্মনিষ্ঠা, অসংখ্য নরনারীর অসংখ্য অভাব অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য ধীর আয়োজন, উন্মাদনার পরিবর্ত্তে কঠিন সংযম, স্থির এবং সংযতভাবে জীবনের সমস্ত কর্ম্মকে এক মহান্ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত করা। যে সমাজ আধুনিক কালেও বিদ্যাসাগরের ন্যায় দীনদুঃখীর জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন ও নিষ্কাম অধ্যবসায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরহিতব্রত ও কর্ম্মনিষ্ঠা, বিবেকানন্দের অদম্য তেজ ও উৎসাহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এখনও তাঁহাদের ধন্য জীবনের সাধনাকে জীবন্ত রাখিয়াছে, সেখানে নবযুগের নূতন কর্ত্তব্যপালনক্ষম সাধক কর্ম্মীগণের কখনই অভাব হইবে না।

দশম অধ্যায়

পল্লীসেবক

ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র—পল্লীগ্রাম ; ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র—সহর

বাঙ্গালাদেশে কয়েকবৎসর হইতে শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন চলিতেছে। দেশের আধুনিক শিক্ষা যে দেশবাসীর উপযোগী নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন। নূতন প্রকারের অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন কি নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। কিন্তু এই বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা দেশবাসীর প্রকৃত অভাব মোচন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। দেশবাসী কাহারা এবং দেশবাসীদের প্রকৃত অভাব কি—এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের ভুল ধারণা আছে। কেবল মাত্র ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লইয়া দেশ নহে, কয়েকটি সহর মিলিয়া দেশ গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশকে বুঝিতে হইলে সহরের বড় রাস্তা, আফিস-আদালত ছাড়িয়া শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছায়া-সুনিবিড় পল্লীগ্রামে আসিতে হইবে। দেশবাসীর হৃদয় বুঝিতে হইলে স্বদেশহিতৈষীর বক্তৃতা এবং উকিল-হাকিমের জারিজুরীর

প্রতি মনোযোগ না দিয়া, যে কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে রামপ্রসাদী গান ধরিয়াছে তাহার গানের সহিত আমাদের অন্তরের সুর মিলাইতে হইবে। বাস্তবিক বাঙ্গালাদেশে সহরের সংখ্যাই বা কত? খুব জোর ১৯০, কিন্তু গ্রামের সংখ্যা ২০৩,৬৫৪। দেশবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন পল্লীগ্রামে এবং কেবল মাত্র ৫ জন সহরে বাস করে। সুতরাং বাঙ্গালীর কোন অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন আয়োজন করিবার সময় যদি পল্লীবাসীদের কথা ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

বাস্তবিকপক্ষে "দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরই জাতির বাসস্থান"—এ কথা আমাদের দেশের প্রতি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। ইহার কারণও আছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর সহরের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক উন্নতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ জন্য সেখানে সহরগুলিই সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ। কয়লা এবং শিল্পদ্রব্যের উপাদান যেখানে সহজে পাওয়া যায়, দ্রব্য প্রস্তুত-করণ ও দ্রব্য বিক্রয়ের যেখানে সুবিধা আছে, সেখানে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, অসংখ্য শ্রমজীবী এবং ব্যবসায়ী আসিয়া সেখানে সহর সৃষ্টি করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতিমূলক সভ্যতা সহরেই পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতির উপর ভারতবর্ষের জাতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রাকৃতিক 'জন্ম-নিকেতনের' প্রভাব হেতু আমাদের দেশ কৃষিকার্য্যে

উন্নতি লাভ করিয়া অতি প্রাচীন কালেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য-জগতে সহরগুলি যেরূপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, আমাদের দেশের গ্রামগুলি সেরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতির দ্বারা বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এ জন্য ভারতবর্ষের সভ্যতা পল্লীগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছে—সহরে, রাজধানীতে নহে। আধুনিক ইউরোপের সমস্ত বড় বড় সামাজিক, বৈষয়িক এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আন্দোলনগুলি সহরে উদ্ভূত হইয়া সেখানকার চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের দ্বারা পুষ্ট হইয়া অবশেষে পল্লীগ্রামে পৌঁছিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত। আমাদিগের অতীত ইতিহাসের সমস্ত আন্দোলনগুলি পল্লীগ্রামের চিন্তা দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। আমাদিগের যাবতীয় দর্শন এবং বিজ্ঞানের সত্যসমূহ তপোবনেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ, কপিল, বিশ্বামিত্র, শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নানক, গুরুগোবিন্দ, রামদাস, তুকারাম, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত, যাঁহারা ভারতবর্ষের শিক্ষা-গুরু, যাঁহাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রাণ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাদিগের সাধনায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্য পল্লীজীবনের চিন্তা এবং কর্ম্ম প্রণালীর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে পল্লী ও নগরের ভাব-বিনিময়

কিন্তু পল্লীগ্রামে যে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে সহরগুলিও অনতিবিলম্বে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া

উঠিত। ভারতবর্ষের প্রধান নগরগুলি অধিকাংশই দেবতার আবাস-ভূমি, পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র। বৎসর বৎসর অসংখ্য তীর্থযাত্রিগণ ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পল্লীসমূহ হইতে যখন সেই সকল নগরীতে উপস্থিত হইত, তখন নানাধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইত, নূতন বিজ্ঞান এবং দর্শনবাদের মীমাংসা হইত, যাহা সত্য তাহা গৃহীত এবং তাহারই প্রচার হইত। এইরূপে মহানগরী এবং তীর্থক্ষেত্রসমূহেই ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মের আন্দোলনগুলির শৃঙ্খলা ও সমন্বয় সাধিত হইত। ভারত-বর্ষের সমস্ত মহাপুরুষগণ সাধু এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট তাঁহাদিগের সত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এই সকল স্থানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান মনে করিতেন। অসংখ্য নরনারীর চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদিগের সত্যগুলি এইরূপে একটা বিচিত্র এবং অসীম শক্তি লাভ করিত, তখন প্রচার-কার্য্যের আর কোন বিঘ্ন থাকিত না। মহর্ষি বশিষ্ঠের ধর্ম্মজীবনের সহিত অযোধ্যানগরী এবং যাজ্ঞ-বল্ক্যের সহিত মিথিলানগরী বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সূচনা বারাণসীতেই হইয়াছিল এবং পরে পাটলিপুত্র-নগরীকে কেন্দ্র করিয়া বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম এবং সাধনা জগৎময় পরি-ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাবা নানক এবং গুরুগোবিন্দের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে অমৃতসহরনগরী, তুকারাম এবং রামদাসের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে পুণা ও সতারানগরী এবং চৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে নবদ্বীপ এবং শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যনাম ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। আধুনিক ইউরোপ যেরূপ পল্লীগ্রাম হইতে প্রকৃতিজাত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া কল-

কারখানায় প্রয়োজনীয় বিলাসের সামগ্রী প্রস্তুত করতঃ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিতেছে, সেরূপ প্রাচীন ভারতে পল্লীগ্রামের সাধনালব্ধ মহনীয় ভাবগুলি নগর এবং তীর্থক্ষেত্রসমূহে মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক কেন্দ্রীকৃত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষময় প্রচারিত হইত। পল্লীগ্রাম এবং নগর-জীবনের মধ্যে এরূপ ভাবের আদান-প্রদান সম্বন্ধ থাকায় আমাদিগের দেশে সত্য আবিষ্কার এবং সত্যপ্রচারের বিশেষ স্মুবিধা ঘটিয়াছিল।

সহর এবং পল্লীগ্রামের সে সম্বন্ধ এখন লোপ হইবার মত হইয়াছে। ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে সম্পূর্ণ নূতন নূতন ভাব ও শক্তি প্রবেশ করিতেছে। দেশে অসংখ্য রেলের রাস্তা স্থাপিত হইতেছে, সহরের ছাপাখানায় অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ছাপা হইয়া প্রত্যহ গ্রামে গ্রামে বিক্রীত হইতেছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আর পুরাতন নিয়মে চলিতেছে না। পোষ্টমাষ্টার বাবু এবং পিয়নের সঙ্গে বিদেশী মহাজনের ব্যাপারী এবং পাইকারগণও দেখা দিয়াছে। গুরুমহাশয়ের টোল উঠিয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে নিম্ন প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। মাঝে মাঝে নরমাল স্কুলে পাশ ইনস্পেক্টর বাবুও দেখা দিতেছেন। হাট বাজারে কেবলমাত্র স্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য যে বিক্রয় হয় তাহা নহে, সহর হইতে চিনি, বিলাতী কাপড় এবং কেরোসিন তৈলেরও আমদানী হইতেছে। মণিহারী দোকান বেশ পসার জমাইয়াছে।

পল্লীগ্রামগুলি সমস্ত বিষয়ে সহরের অনুগামী হইবার জন্য ব্যস্ত। সহরে যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিপত্তি, সমস্ত গ্রামগুলি তাহাই

অনুকরণ করিবার জন্য লালায়িত। পল্লীগ্রাম এবং নগরের পূর্ব্বেকার ভাববিনিময়ের সম্বন্ধ আর নাই। নগরগুলিই এখন দৃষ্টান্তস্থল এবং পল্লীগ্রাম তাহার অনুগামী মাত্র।

আধুনিক ভারতে পরানুকরণ

আমাদিগের একটা বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে,—ইউরোপ তাহার কত শতাব্দীর বিপুল প্রয়াস, দুঃখ এবং সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া ক্রম-বিকাশের ফলে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা নকল করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকেই ধন্য মনে করি। সে অবস্থায় উপস্থিত হইবার জন্য সমাজের কিরূপ বল এবং সামর্থ্য আবশ্যক তাহা ভাবিয়া দেখি না। সে অবস্থায় আমাদিগের সমাজ তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহা চিন্তা করিবার অবসর নাই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে—ইউরোপের সেই অবস্থা ইউরোপীয় সমাজের পক্ষেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিদায়ক কি না এবং মানব-সভ্যতার কত দূর পরিপোষক, তাহা আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদিগের দেশে বৈষয়িক অবনতি হইয়াছে, অমনি আমরা ইউরোপের অর্থোৎপাদন-প্রণালীগুলি নকল করিয়া চারিদিকে কলকারখানা খুলিতেছি। ইউরোপ বাণিজ্যব্যবসায় দ্বারা ধনী হইয়াছে, অমনি আমরা কৃষি-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসিবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতা নগর-জীবন-গঠনকেই তাহার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, এই জন্যই পল্লীজীবনের প্রতি আমাদিগেরও

বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, নাগরিক জীবনকে আদর্শ মনে করিয়া আমরাও স্বকীয় সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিতেছি। ফলতঃ, ভারতবর্ষ আধুনিক ইউরোপকে অনুকরণ করিয়া তাহার পল্লী-জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে; ইহাতে কেবলমাত্র যে তাহার সভ্যতা-বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে আমাদের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবারও সম্ভাবনা হইয়াছে। ইউরোপকে এ বিষয়ে অনুকরণ করিতে যাওয়া যে আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

আমাদিগের দেশে আধুনিককালে কতকগুলি সহর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের এখনও হৃদয়ের কোন সংযোগ হইতে পারে নাই। ইউরোপ হইতে আমরা আমাদিগের সহরে সভা, সমিতি, ইউনিয়ন. ক্লাব, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী সমস্ত লইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এগুলির সেরূপ প্রাণ নাই। উহাদিগকে আমরা আত্মীয় করিয়া লইতে পারি নাই। ভারতবর্ষের সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতাকে এখনও আপনার নিগূঢ় প্রাণশক্তিদ্বারা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের নগরজীবন ইউরোপীয় নগরজীবনের অন্ধ এবং মূঢ় অনুকরণ হইয়াছে মাত্র।

অন্যদেশের মাটী হইতে শিকড় উৎপাটন করিয়া কোন গাছকে যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থানে আনা যায়, সে ঐ নূতন মাটীর রস আকর্ষণ করিতে না পারিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় বিবিধ অনুষ্ঠানগুলির আমাদিগের দেশে আসিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সনাতন ভূমির সঙ্গে উহাদিগের কোন পরিচয় নাই এবং কখনও হইবে কি না তাহাও বলা যায় না। অধিকন্তু, আমরা স্বকীয় মনুষ্যত্বটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য জড় অংশকে সহজে অনুকরণ করিবার ফলে আমাদিগের বিশেষত্ব—সামাজিক জীবনের নিষ্ঠা ও সংযম, এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্য—ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ভগবানে অবিশ্বাস, অর্থ-পৈশাচিকতা, গৃহবন্ধনের শৈথিল্য, চরিত্রহীনতা, বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি পাপ আমাদিগের নাগরিক জীবনকে ক্রমশঃ আক্রমণ করিতেছে।

পল্লীজীবনের স্বাতন্ত্র্যলোপে আধুনিক ইউরোপের অবনতি

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় নগরজীবন এবং পল্লীজীবনের কি সম্বন্ধ তাহা এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য সমাজে পল্লীজীবন এবং নগরজীবনের যে সম্বন্ধ আছে তাহা আমাদের আদর্শ হইবার উপযুক্ত কি না এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগতে গ্রামগুলি সমস্ত বিষয়েই সহর এবং নগরীকে অনুকরণ করে। নগরগুলি এরূপে সমস্ত বিষয়ে গ্রামের চিন্তা এবং কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহার ফলে জাতীয় সভ্যতা বিভিন্নমুখী না হইয়া একমুখী হইতেছে, বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে।

পল্লীবাসীদিগের নিজস্বরুচি আর নাই, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," এ কথা এখনকার পাশ্চাত্য সভ্যজগতে খাটে না। যাহা সহরের রুচি তাহাই গ্রামে আদৃত হইবে। এজন্য লণ্ডন, পারী, নিউ-ইয়র্কের হাটবাজারে মাল যাচাই না করিয়া কোন ব্যবসায়ী সন্তুষ্ট হয় না, কারণ সেখানে যদি উহার আদর না হয় তাহা হইলে দেশের কেহই উহা লইবে না। যাহা কিছু নূতন—বিলাসের সামগ্রী হউক অথবা চিন্তাশীল ব্যক্তির গভীর গবেষণার ফল বা পাগলের পাগলামি হউক না কেন, উহার দ্বারা যদি সহর একবার মাতিয়া উঠে, তাহা হইলে সমগ্র দেশে উহার আদরের সীমা থাকে না। রাজধানী হইতে সমস্ত দেশ জুড়িয়া শতধারায় যে বন্যার জল বহিতে থাকে, তাহাতে পল্লীগ্রাম ও সহরের সকল বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য একেবারেই ধুইয়া যায়। গ্রাম্য সাহিত্য, গ্রাম্য শিল্পকলা, গ্রাম্য আচার ব্যবহার এবং আমোদ-প্রমোদ ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। গ্রামের আপনার হৃদয় বা প্রাণ নাই, গ্রাম এখন সহর এবং রাজধানীর ছায়ামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ সহরগুলি তাহাদিগের নিজেদের মাপকাঠির দ্বারা দেশের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মকে বিচার করিতেছে। এই ঐক্য ও সমতা এখন সভ্যতার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পল্লীজীবনের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব লুপ্ত হওয়াতে জাতীয় সভ্যতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে।

ইউরোপ তাহারই সভ্যতার জন্মস্থান পল্লীগ্রামকে এখন ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। মধ্যযুগে যখন পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীর

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন পল্লীগ্রামের শান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্য হইতে ভাবুক এবং কর্ম্মিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইউরোপের তাৎকালিক সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। আধুনিক ইউরোপ অশান্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল সন্তানের মত স্বীয় সভ্যতার জননী শান্তিময় পল্লীজীবনকে অবজ্ঞা করিতেছে।

পল্লীগ্রামের সে দিন আর নাই। ইউরোপ এখন অসংখ্য রেলরাস্তা স্থাপন করিয়াছে, অসংখ্য কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছে, বৈষয়িক উন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর না করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অসংখ্য জাহাজ পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে এখন ইউরোপের কুঠি এবং বাণিজ্যাগারের উপকরণ যোগাইতেছে। অসংখ্য শ্রমজীবী পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরের কল-কারখানায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে। পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইলেও প্রকৃতিজাত দ্রব্যের অভাব নাই, কারণ বিদেশ হইতে দ্রব্যের আমদানী হইতেছে। যতই গ্রামগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি-কল্পে তাহার পল্লীগ্রামগুলি বিসর্জ্জন দিয়াছে—বিপুল অর্থ-লাভের জন্য তাহার সামাজিক জীবনের সুখ এবং শান্তি চিরকালের জন্য হারাইতে বসিয়াছে।

আদর্শ সভ্যতার লক্ষ্য

কিন্তু সমাজের এক স্থানের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভাবিয়া

দেশের অন্যান্য স্থানের চিন্তা ও কর্ম্মজীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে বিচার ও নিয়ন্ত্রিত করিলে, জাতীয় সভ্যতাকে দরিদ্র করা হয় এবং দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন ও চিন্তাজীবনের বিকাশের পথ রোধ করা হয়। পল্লীজীবন এবং নগরজীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পল্লীজীবন এবং নগরজীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করে। পল্লীগ্রামে জাতির বৈষয়িক এবং সামাজিক জীবনের সমস্ত উপাদান এবং উপকরণগুলি উৎপন্ন হয়। পল্লীগ্রামে সমাজের নিত্য আহারের সংস্থান হয়। পল্লীগ্রামের প্রকৃতিজাত বস্তু সহরে আনীত হইলে, সহর তাহার কলকারখানার সাহায্যে উহা হইতে নানা প্রকার দ্রব্য এবং বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করে। এইরূপে নিত্যনৈমিত্তিক অভাব-মোচনোপযোগী দ্রব্যাদির উপকরণ যোগাইয়া পল্লীগ্রামগুলি যেরূপ বৈষয়িক জীবন যাপনের সহায় হয়, সেরূপ সামাজিক জীবনের উপাদানগুলিও পল্লীগ্রামের আব্‌হাওয়াতেই উৎপন্ন হয়। নগর এই সমস্ত উপকরণগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমাজের চিন্তা এবং কর্ম্মের গতি ও প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। নগরে শক্তির ব্যবহার এবং বিকাশ, কিন্তু শক্তির জন্ম পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামই ভাবুকতার জন্মভূমি, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রই বিরাট এবং মহনীয় ভাব আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠ স্থান। পল্লীগ্রামে চতুরতা প্রশ্রয় পায় না.—নিষ্ঠা, প্রেম, সংযম, মহত্ত্ব, পবিত্রতা এবং সত্যানুরাগ, মানব-হৃদয়ের সমস্ত দেবভাবগুলি পল্লীগৃহেই অঙ্কুরিত হয়। গ্রামের চিন্তার মধ্যে স্বভাবতঃই একটা সরস মৌলিকতা এবং ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়, যাহার জন্য তাহারা অনেক সময়ে অসীম শক্তি লাভ করে।

বাস্তবিক, যে সমস্ত বিপুল আন্দোলন অতীতকাল হইতে পৃথিবীর বক্ষ আলোড়িত করিয়া মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে, সে সমস্তই সহরের কর্ম্মময় ব্যস্ততা হইতে অনেক দূরে পল্লীজননীর নিভৃত ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, কনফুশিয়াস, সাদী, হাফিজ, সেণ্টফ্রান্সিস, মার্কস, পেষ্টালজি সকলেই বিশ্বপ্রকৃতির নিকট তাঁহাদিগের শিক্ষা এবং দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অরণ্য, প্রান্তর, মরুভূমি অথবা গিরিগহ্বরেই তাঁহারা জ্ঞানের আলোক পাইয়াছিলেন। পল্লীগ্রামগুলি এই সমস্ত জগদ্গুরুগণকে লালনপালন করিয়া জগতকে সভ্য করিয়াছে। পল্লীগ্রামই সভ্যজগতের জন্মস্থান।

ভারতবর্ষে পল্লীগ্রামের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা

ভারতবর্ষের পল্লীজীবন আজকালকার নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া কি ভাবে গঠিত হইবে তাহাই এখন বিবেচ্য। প্রতীচ্যের প্রভাব ভারতবর্ষের নগরেই প্রথম আসিয়াছে, এমন কি আজকালকার নগরগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই সৃষ্ট। কিন্তু এই পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতের জীবন-প্রবাহকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের জাতীয় প্রাণধারা এখনও পল্লীগ্রামে প্রবাহিত হইতেছে। পল্লীবাসীদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শগুলি এখনও বিদ্যমান। পল্লীসমাজে এখনও পরনির্ভরতা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা এবং স্বায়ত্তকর্ম্ম এখনও সেখানে বিকাশ লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা

পল্লীগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সত্য, কিন্তু তবুও সেখানে চরিত্রের মাহাত্ম্য, ত্যাগস্বীকার, কর্ত্তব্যবোধের যথেষ্ট নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবন এবং মহাপ্রাণতা এখনও পল্লীগ্রামকে উন্নত রাখিয়াছে। এখন আমাদের স্বদেশসেবকগণকে পল্লীজগতের চিন্তা ও কর্ম্মকে, পল্লীগ্রামের এই সনাতন জীবনপ্রবাহকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের চরিত্রদোষে পল্লীসমাজ এখন কঠোর দারিদ্র্যব্যাধি-গ্রস্ত। পল্লীবাসীর অন্নবস্ত্রাভাব এখন তাহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্যদোষে ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার আদর্শ মলিন হইয়া পড়িয়াছে। নানা উপায়ে এই দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে, দারিদ্র্য মোচন করিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সুমহান্ আদর্শকে জগতের সমক্ষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বৈরাগ্য তখন সম্মিলিত হইয়া একটা মহাজীবনের সূচনা করিয়া দিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই মহামিলনের সঙ্গমতীর্থ হইবে,—ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম।

কয়েকটী পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানের আলোচনা

পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের দ্বারা সেখানকার দেশহিতৈষিগণ দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগের দেশের সে গুলি উপযোগী কি না প্রত্যেক সমাজ-সেবকের তাহা আলোচনার বিষয়। বিশেষতঃ যে

সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা কৃষককুলের দারিদ্র্য-হ্রাস এবং ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, সে গুলি আমাদের দেশে প্রয়োজ্য কি না তাহা বিচার করিতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে বিপুল বাণিজ্য-ব্যবসায়ের আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার ফলে ইউরোপীয় সমস্ত জাতিই কলকারখানার বিরাট আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় জগতে আর একটি আন্দোলনের সুচনা হইয়াছিল. ইহার দ্বারা সেখানকার কৃষিকার্য্যের বিপুল উন্নতি সাধিত হইতেছে। ইহার নাম সমবায়-আন্দোলন, বা কৃষিকার্য্যে যৌথ কারবার প্রচলন। সুল্‌শ্‌, রাইফেজেন, হাস, উলেমবার্গ, লুজাত্তী, ডুপোর্ট প্রভৃতি সমাজ-সেবকগণ আপনাপন সমাজের দারিদ্র্য-পীড়িত এবং ঋণভারগ্রস্ত কৃষিজীবিগণের দুঃখ মোচন করিবার জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জর্ম্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কৃষকসমাজ নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছে। কৃষিজীবিগণকে ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

যৌথ-ঋণ-দান-মণ্ডলী

কোন কৃষকের ঋণ গ্রহণের সময় যদি তাহার ঋণভার অন্য কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে মহাজনের অর্থনাশের বিশেষ আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং সুদের হার সে কম করিয়া দিতে পারে। কয়েকজন কৃষক এইরূপে একটি মণ্ডলী

স্থাপন করিয়া মণ্ডলীর নিকট হইতে অল্প সুদে ধার লইতে পারে। মণ্ডলী কৃষকগণকে ঋণ দিবার জন্য যে দেনা করে তাহার জন্য কোন একজন কৃষক বা সমস্ত কৃষক মিলিয়া দায়ী থাকে। ইহাকে অসীম-দায়িত্ব বিশিষ্ট-ঋণ-দান-মণ্ডলী বলা যায়। কৃষকগণও যাহাতে মণ্ডলীতে আমানত রাখে তাহার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হয়। পরিশেষে যখন মণ্ডলীর সভ্যগণের আমানত টাকা উহার বাহিরের দেনার সমান হয়, তখন বাহিরের টাকা ফেরত দিয়া আমানত টাকাই সমিতির মূলধনরূপে পরিণত হয়।

প্রত্যেক কৃষকের ঋণের জন্য মণ্ডলীর অন্য সভ্যেরা দায়ী বলিয়া তাহার গৃহীত ঋণ যাহাতে যথাকার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং অতি অল্প ব্যয়ে যাহাতে সে তাহার অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে তাহার প্রতি সকলে লক্ষ্য রাখে। সভ্যেরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্য-প্রণালী বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, উপরন্তু এ কারণে উহা-দিগের কর্ম্মশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সমবেত কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন-প্রকারে সমাজের মঙ্গলসাধন করে।

আমাদিগের দেশে এইরূপ ঋণ-দান-মণ্ডলী স্থাপনের সূচনা হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষকগণ কেবলমাত্র যে ঋণভার হইতে মুক্ত হইতেছে তাহা নহে। অনেক স্থলে বিবাহশ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে কত অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত, তাহাও সমিতির দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া কৃষকদিগের ঋণভার লঘু হইতেছে। গ্রামে হিংসা-বিদ্বেষ এবং দলাদলির ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, মামলা

মোকদ্দামা অনেক সময় সমিতির দ্বারাই নিষ্পত্তি হইতেছে, দরিদ্র কৃষকগণ মিতব্যয়ী হইতে শিখিয়াছে, এরূপে তাহাদিগের সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থা বিভিন্ন প্রকারে উন্নতি লাভ করিতেছে।

যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলী এবং যৌথ-শস্য-ভাণ্ডার

পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবলমাত্র ঋণদানমণ্ডলী স্থাপনের দ্বারা যে কৃষকসমাজের উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা নহে। আরও অনেক প্রকার সমবায়-অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল। কৃষকগণ যাহাতে তাহাদিগের শস্য সুবিধা মত বিক্রয় করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছিল। সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া সমিতির উপর শস্য বিক্রয়ের ভার প্রদান করিয়া ইউরোপীয় কৃষকগণ বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছে। কৃষিপ্রধান দেশে দালাল এবং পাইকারগণ কৃষিজাত দ্রব্যের লাভের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে। কৃষকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে শস্যোৎপাদনের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে শস্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, ফলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি লাভ করিয়াও কৃষকগণ লাভবান হইতে পারে না। এ স্থলে গ্রাম্যসমিতি কেবলমাত্র ঋণদানে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি কৃষকগণের পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ভার লইতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমাদিগের দেশে কৃষকগণ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াও যে লাভবান হইতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ তাহারা দালাল-গণের নিকট হইতে দাদন লইয়া উহাদিগকে অত্যল্প মূল্যে

ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। দুই একটি উদাহরণ দিলে ইহা বুঝা যাইবে। পাট চাষের জন্য কৃষকেরা আষাঢ় মাসে ৫৲ অথবা ৫॥০ দাদন লইয়া আশ্বিন মাসে দালালকে এক মণ পাট দিয়া থাকে। এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া দালালেরা ৯৲—১০৲ পাইয়া থাকে। সুতরাং কৃষকগণ অর্থাভাব এবং দাদন গ্রহণের জন্য লভ্যের অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত হয়। তিসি অথবা বুট চাষের জন্য দালালেরা কৃষককে ৫৲ অথবা ১॥০ ঐ দুইটি ফসল উৎপাদনের জন্য দাদন দিয়া থাকে। তিন চারি মাস পরে দালালেরা কৃষকের নিকট এক মণ তিসি অথবা বুট পাইয়া উহা ৭৲ অথবা ২॥০ দরে সহরের হাটে বিক্রয় করে। এ স্থলে যদি কৃষকগণ কোন গ্রাম্যসমিতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সমিতির দ্বারাই তাহাদিগের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার তাহাদিগের কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। আধুনিক অবস্থায় কৃষকগণ 'নয়ালির' সময় (যে সময় নূতন শস্যের আমদানী হয়) শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, তখন শস্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। যৌথ-বিক্রয়-সমিতি এবং যৌথ-ভাণ্ডার স্থাপন করিলে বাজার মন্দা হইলেও পণ্যদ্রব্য 'ধরিয়া রাখা' যাইতে পারে; এবং পরে উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে ন্যায্য দরে তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইতে পারে। মধ্যবর্ত্তী সময়ে কৃষকগণের সংসার-খরচের জন্য সমিতি তাহাদিগকে ঋণ দিবে। বাস্তবিক পল্লীগ্রামে যৌথ-ভাণ্ডার এবং যৌথ-বিক্রয়মণ্ডলী স্থাপন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ইহাদিগের দ্বারা কৃষকসমাজ পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ের

সুবিধা লাভ করিয়া স্বকীয় পরিশ্রম সার্থক করিতে পারিবে। তাহাদিগের উৎসাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তখন ঋণ-গ্রহণের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী

কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানের জন্য যৌথ-ঋণ-দানসমিতি, শস্য-ভাণ্ডার এবং বিক্রয়-সমিতি যেরূপ প্রয়োজনীয়, যৌথ-ক্রয়-সমিতিও সেরূপ আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পাদনের জন্য অভিনব যন্ত্র এবং কৃত্রিম সারাদির ব্যবহার আবশ্যক। ইহাদিগের মূল্য অধিক বলিয়া পরস্পরের সহায়তা ভিন্ন ঐগুলি ক্রয় করা অসাধ্য। যৌথ-ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিলে পরস্পরের সাহায্যে পাইকারী দরে উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র এবং সারক্রয় এবং বীজশস্য সংগ্রহ করা খুব সুবিধাজনক হইবে। হলাণ্ড, বেলজিয়াম, জর্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, বোহিমিয়া, মোরেভিয়া প্রভৃতি প্রদেশে এই প্রকার যৌথ-ক্রয় সমিতির দ্বারা সেখানকার কৃষকেরা নানাপ্রকার যন্ত্র এবং কৃত্রিম সার ব্যবহারের সুবিধা লাভ করিয়া তাহাদিগের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে।

কৃষিকার্য্যে সমবায়

বাস্তবিক পক্ষে সমবায়-প্রণালী প্রয়োগ না করিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি অসম্ভব। ব্যবসায়ে যেমন কলকারখানার আয়োজন না করিলে ফললাভ করা সুকঠিন, সেরূপ কৃষিকার্য্যে পরস্পরের

সহায়তা দ্বারা শস্যোৎপাদন এবং শস্যবিক্রয়ের সুবিধা না থাকিলে উহা বিশেষ লাভজনক হয় না। কৃষিকার্য্যে কলের উপর নির্ভর না করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। মানুষ তাহার বুদ্ধি এবং পরিশ্রম নিয়োগ করিয়াও শস্যোৎপাদনের সময় কামাইতে পারে না। কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে বা অধিক সংখ্যক কৃষক নিযুক্ত করিলেও ধান চাষে যে ছয় সাত মাস লাগে তাহা কমে না। এজন্য বৃহৎ আয়োজন করিলে কারখানার কার্য্য যেমন শীঘ্র এবং অল্প খরচে সম্পন্ন হয়, কৃষিকার্য্যে তাহা হয় না। বস্তুতঃ কৃষিকার্য্যে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানই লাভজনক। অথচ ঋণ গ্রহণ, শস্যোৎপাদন ও শস্যবিক্রয় সম্বন্ধে অল্প মূলধনবিশিষ্ট সামান্য কৃষকের অনেক অসুবিধা আছে। এই সকল অসুবিধা অনেকগুলি কৃষক মিলিত হইয়া কাজ করিলে দূরীভূত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল এইরূপ নানা ক্ষেত্রে সমবায় প্রথা অবলম্বিত হইতেছে। আমাদিগের দেশে কৃষিজীবিগণের মধ্যে সমবায় প্রণালীর প্রচলন বিশেষ আবশ্যক। সমবায়-অনুষ্ঠান যে আমাদিগের দেশে নিতান্তই নূতন তাহা নহে। বাস্তবিক, আমাদিগের পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্যে সমবায়-অনুষ্ঠান অনেকদিন হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদিগকে এ বিষয়ে ইউরোপের নিকট নূতন করিয়া বেশী কিছু শিখিতে হইবে না।

আত্মনির্ভরতা এবং সমবায়-প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মজ্জাগত

আমাদিগের দেশের কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে পরস্পরের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বেশ ভাল করিয়াই বুঝে। গ্রামে অনেকগুলি কৃষক প্রায়ই মিলিত হইয়া জমি চাষ করে। অন্যূন ১৫, ২০ জন এরূপে প্রত্যহ একজন বন্ধুর জমি তৈয়ারী করে। যাহার জমি তৈয়ারী হয় সে তাহার সমস্ত বন্ধুদিগের জমি যতদিন না তৈয়ারী হয় ততদিন তাহাদিগের সঙ্গে পরিশ্রম করে। এরূপে অল্পসময়ে এবং অল্প আয়াসে সকলেরই জমিতে লাঙ্গল এবং সার দেওয়া হয়। ইহাকে প্রচলিত কথায় 'গাঁতা' বলে। ধান্য-রোপনের সময় এইরূপ সমবেত প্রণালীতে কৃষকগণ নিড়ানি কার্য্য ও সম্পন্ন করে। গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে "ছাঁটা" বলে। গুড় তৈয়ারী করিবার সময় কৃষক-দিগের সহকারিতার আর একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্ত কৃষক মিলিত হইয়া একটি ইক্ষু-পেষণ-যন্ত্র ক্রয় করে বা ভাড়া লয়। ইক্ষু চাষ শেষ হইলে কৃষকেরা সমবেত হইয়া ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রস বাহির করিয়া গুড় তৈয়ারী করে। রস বাহির করিবার সময় সকল কৃষকেরই হালের বলদ নিযুক্ত হয়। এই প্রকার পরস্পরের সহায়তায় কার্য্যকরণপ্রণালীর উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। দুই তিনটি গ্রামের কৃষকেরা অনেক সময়ে সমবেত হইয়া কয়েকজন রাখাল বালক নিযুক্ত করে। কাহারও গো-মহিষাদি অপরের জমিতে আসিয়া শস্য নষ্ট না করে তাহা

দেখিবার ভার রাখালবালকদিগের উপর ন্যস্ত হয়। যাহার গরু বা মহিষ অপরের জমিতে আসে, তাহাকে কিছু জরিমানা দিতে হয়। জরিমানার টাকায় বালকদিগের মাহিয়ানা দেওয়া হয়। এরূপে কয়েকটি গ্রাম সমবেত হইয়া খোঁয়াড়ের কার্য্য অল্প ব্যয়ে এবং পরিশ্রমেই চালাইয়া থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে সমবেত কার্য্যকরণ এবং পরস্পর বিশ্বাসের উদাহরণ আমাদিগের পল্লীজীবনে এখনও ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্রামে মামলামোকদ্দমা আরম্ভ হইলে এখনও পল্লীসমাজ তাহার মণ্ডলকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। মণ্ডল এখনও গ্রাম্যবিবাদ, জাতিবিবাদ, গৃহবিবাদ, ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন। গ্রামবাসী অধিকাংশ স্থলেই মণ্ডলের পরামর্শ না লইয়া আদালতে যায় না। মণ্ডল কখন কোন ব্যক্তির অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরামর্শ দেন না। প্রত্যেক গ্রামবাসীর সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, তাই পল্লীসমাজস্থ কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হয়। মণ্ডল শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। রাজদণ্ড অপেক্ষা মণ্ডলের নিকট অপমান এবং লাঞ্ছনা পল্লীবাসীরা অধিক ভয় করে। বাস্তবিক আমাদিগের দেশের জনসাধারণ চিরকালই রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিগণকে বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষার ভার সমর্পণ করতঃ গ্রামের মণ্ডলের অধীনে থাকিয়া গ্রাম্যজীবনে সুখ এবং শান্তি-স্থাপনের জন্য আপনাদিগের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিত। জন-সাধারণের সমবেত চেষ্টায় এবং উদ্যোগে সামাজিক জীবনে

শৃঙ্খলাবিধান বিশেষ কঠিন হইত না। তাহার ফলে আমাদিগের পল্লীগ্রামগুলি স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়া বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পথে বিকাশলাভ করিতে পারিত। রাষ্ট্রীয় জীবন আমাদিগের দেশে সমাজের সমস্ত শক্তিকে কখনও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সমাজের জীবনীশক্তি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত থাকায়, রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি অবনতির সঙ্গে আমাদিগের জাতীয় শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় নাই। পল্লীগ্রামসমূহ এরূপে স্বাধীন চিন্তা এবং কর্মশক্তির আধার হইয়া সমগ্র সমাজের আত্মশক্তি আত্মনির্ভরতা, পরস্পর সহানুভূতি এবং সমবায় প্রবৃত্তিকে আজও পর্যন্ত সজীব রাখিতে পারিয়াছে।

আমাদের কর্তব্য

পল্লীসমাজের এই সমবায় প্রবৃত্তি এবং আত্মনির্ভরতাকে এখন আধুনিক ধনবিজ্ঞানের শিক্ষার দ্বারা অধিকতর কার্যকরী এবং আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

এই জাতিগত সমবায় প্রবৃত্তিকে অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় নিয়োজিত করিয়া আমাদিগের দেশের দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে ঋণ-দান-সমিতিতে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গোমহিষাদি পশু, এবং উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র, সার এবং বীজ-শস্যের সংগ্রহ এবং ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যৌথ বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গ্রামের উৎপন্ন শস্যসমূহ ন্যায্য

দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে শস্যগোলা স্থাপন করিয়া কৃষকগণকে সাময়িক ভরণ-পোষণের নিমিত্ত অল্প সুদে শস্য কর্জ্জ দিতে হইবে। বিদেশী মহাজনকে শস্য কর্জ্জদান, শস্যসঞ্চয় এবং শস্যরপ্তানি ইত্যাদি ব্যবসায়ে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না দিয়া, গ্রাম্য সভার দ্বারাই গ্রাম্য শস্যের আদান-প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অপরিমিত পরিমাণে শস্যরপ্তানি বন্ধ করিয়া গ্রামের সঞ্চিত শস্য যাহাতে দুর্ব্বৎসরে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীভাণ্ডার স্থাপন করিয়া কৃষিজীবিগণের জন্য বস্ত্র, তৈল, লবণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী পাইকারী দরে বিক্রয় করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করিয়া মড়ক ইত্যাদি সময়ে গো মহিষাদির জীবন বীমা করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বৃষ ক্রয় করিয়া আনিয়া গোবংশের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিল্প-জীবিগণের জন্য যৌথ ঋণদান-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পকর্ম্মের উপযুক্ত যন্ত্র ও উপকরণ পাইকারী দরে ক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পিগণের প্রস্তুত দ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তন্তুবায়গণের জন্য তন্তুবায়মণ্ডলী স্থাপন করিয়া সুতা রেশম, রং এবং শিল্পকার্য্যের অন্যবিধ সামগ্রী পাইকারী দরে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্ত্র-বয়নের পর তন্তুবায়গণের যাহাতে বস্ত্র-বিক্রয়ের কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য বিক্রয় সমিতি গঠন করিয়া উহার উপর স্থানান্তরে বস্ত্র-বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। সূত্রধর-

গণের জন্য মণ্ডলী স্থাপন করিয়া বড় বড় গাছ চিড়িবার জন্য উপযুক্ত টেবিল এবং করাত বিতরণ করিতে হইবে। গ্রামের ধীবরগণকে নিকারীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যৌথসমিতি স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ ঘৃত এবং মাখন প্রস্তুত করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ গরুর দুগ্ধ সমিতির কারখানায় আনিয়া কারখানার কলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঘৃত মাখন প্রস্তুত করাইয়া লইবে। পল্লী-সমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামে কয়েকটি ইক্ষু-পেষণ-যন্ত্র, ধান এবং দাল ভাঙ্গার যন্ত্র, আম, কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল এবং বনের মধু হইতে বিবিধ প্রকার আচার এবং মোরোব্বা প্রস্তুত-করণ-যন্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। এ সমস্ত যন্ত্রাদি গ্রামবাসিগণের যৌথ-সম্পত্তি, সুতরাং, সকলেরই ব্যবহার্য্য হইবে। গ্রামকে মহামারী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করিতে হইবে। সমবেত সমিতি গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে কূপ খনন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, খাল কাটিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জল-সরবরাহ, বনজঙ্গল পরিষ্কার, দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, অবৈতনিক কৃষিবিদ্যালয় এবং শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লীসেবকের আবশ্যকতা

এই সমস্ত অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র দেশে প্রসার লাভ করিতে পারে তাহার জন্য পল্লীসেবক আবশ্যক। আমাদের দেশের

জনসাধারণ একেবারেই অজ্ঞ এবং নিরক্ষর এবং নানা কারণে নিশ্চেষ্ট ও উদ্যমহীন। তাহাদিগকে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝাইতে হইবে। ইহাদিগের উপকারিতা একবার বুঝিতে পারিলেই তাহারা উদ্যোগী হইয়া নিজেদের কাজ নিজেরাই করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে প্রচার আবশ্যক এবং প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য অসংখ্য কর্ম্মবীরের উৎসাহ ও ব্যাকুলতা আবশ্যক। বহু বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া উহার কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সহিত না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র অরণ্যে রোদন করিয়াছিলেন, তাঁহার বাণী বাঙ্গালা দেশ শুনে নাই। তাহার কুড়ি বৎসর পরে একজন সন্ন্যাসী দীন-দরিদ্রের জন্য প্রাণে প্রাণে কাঁদিয়া ভারতবাসীর নিকট তাঁহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা এবং অদম্য উৎসাহ দায়স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। দরিদ্র এবং হীনবৃত্তি চণ্ডাল ও যে নররূপী নারায়ণ এবং তাহারই সেবায় যে দেবতার পূজা হয়, ইহাই তাঁহার বাণী। জ্বলন্ত বিশ্বাসে এবং প্রত্যক্ষসাক্ষাৎকারের দৃঢ়তায় সেই বীর সাধক তাঁহার গভীর উদাত্ত স্বরে ভারতবাসীকে শেষ আদেশ দিয়াছেন ঃ—"যাও এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপ-গণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত

হন নাই, - যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক পতিতা রমণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাও তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর—বলি—জীবন-বলি, তাঁহাদের জন্য, যাঁহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিতদের জন্য।"* বিবেকানন্দের আহ্বান ভারতবাসীর নিকট ব্যর্থ হয় নাই। তাহার পর আজ চারি পাঁচ বৎসর হইল আর একজন বাঙ্গালী শিক্ষা-প্রচারক ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নিঃস্বার্থ সমাজসেবা এবং কর্ম্মোপাসনার ভিত্তির উপর শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রচারের গোড়ার কথা,—'সাধনার' মূলমন্ত্র এই,—"ফ্যাক্টরীতে, কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ যথেষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিত হইয়া সকলে নিজেকেই বড় করিতে শিখিয়াছেন। সেরূপ পাণ্ডিত্য বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দরিদ্রের বন্ধু, অশিক্ষিতের সহায়, নিম্নশ্রেণীর উপদেষ্টা লোকহিতৈষী 'মানুষে'র সৃষ্টি করা যায় কি না দূরদর্শী ব্যক্তিগণের তাহাই ভাবিবার বিষয়।" গ্রামে গ্রামে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়া পল্লীতে পল্লীতে দেশের বিচিত্র কথা শুনাইয়া পল্লীজীবনে নূতন নূতন আকাঙ্খা সঞ্চার করিবার জন্য তিনি দেশের শিক্ষিত লোককে পরহিতব্রত গ্রহণ করিতে এবং প্রচারকের জীবন

* পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ।

অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন। "যেখানে অতি নিস্তব্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকেরা শ্রম বিনোদন করিতেছে, যেখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন সময়েই কোন চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয় না, সকলেই শান্তির সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধা করিতেছে, যেখানে সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর এখনো বেশী প্রবেশ করে নাই, যেখানে হিন্দুমুসলমান একমন একপ্রাণ হইয়া পাড়ার সমস্ত কাজ করিয়া থাকে, যেখানে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলত এখনো প্রবিষ্ট হয় নাই, সমস্ত লোকেই পূর্ব্বপুরুষদের চিরন্তন প্রথা প্রত্যেক সামাজিক ও পারিবারিক কাজেই বজায় রাখিবার জন্য যত্নবান, যেখানকার আম কাঁঠাল বনের দেবমন্দির হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এখনও অপসৃত হয় নাই—সেই সুখের নীড়, শান্তির আধার আমাদিগের পল্লীসমাজে নূতন নূতন কথা শুনাইয়া পল্লীবাসীদিগের মনে এক অভিনব ভাব ঢালিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে. দেশের কোথায় কোন্ চিন্তা কোন্ কাজ হইতেছে। সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া এই আধুনিক পৃথিবীর নূতন অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গ্রাম্য জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। গ্রামের সঙ্গে সহরের যে বিরোধ কিছু কাল হইল ঘটিয়াছে. এবং এজন্য পল্লীতে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সমস্তই প্রতিকার করিবার জন্য ঘরে ঘরে—হিন্দু মুসলমান, কৈবর্ত্ত, ব্রাহ্মণ, জোলা, তাঁতী সকলকে শিক্ষাদান করিয়া স্বীয় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে হইবে"।*

* শিক্ষা-সমালোচনা—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত।

এই বিপুল শিক্ষাদান এবং সেবার কার্য্য করিবার জন্য দরিদ্রবন্ধু এবং শিক্ষাপ্রচারক অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে লোক-শিক্ষা-প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গ-দেশের অনেক জেলায় এবং কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন, জাতীয় বিদ্যালয়, সুহৃৎ-সমিতি, শ্রমজীবি-শিক্ষা-পরিষৎ, অবৈতনিক পাঠ-শালা, গ্রন্থাকার, নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণ ও এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন। বিদ্যালয়াদিতে ছাত্রদিগকে ইতিহাস, সাধারণ হিসাব, ভূগোল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য এবং বড় লোকের প্রতিকৃতি দেখান হইতেছে। স্থানে স্থানে কৃষি এবং শিল্প-শিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে।

দুর্দ্দশার পরিমাণ

কিন্তু দেশে কার্য্য আরম্ভ হইলেও প্রয়োজনের অনুরূপ কিছুই আয়োজন নাই। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য লোক একেবারে নিরক্ষর ও দারিদ্র্যপীড়িত। পল্লীবাসীদিগের এখন অসংখ্য অভাব, সে সমস্ত মোচন করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত পল্লীগ্রামে শিবমন্দির কালীমন্দির প্রভৃতি দেবালয় এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, গ্রামের হরিসভার জন্য চাঁদার খাতায় অনেক টাকা বাকী পড়িতেছে, কথকতা, যাত্রাগান, প্রভৃতি উৎসাহ অভাবে ক্রমশঃ লোপ পাই-তেছে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না, নদীগুলি সংস্কার অভাবে

ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে। গ্রামে পানীয় জলের অভাব দেখা গিয়াছে। সমৃদ্ধিশালী নগরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ধনীলোকের অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, অথচ তাঁহাদিগের জন্মস্থানের দারিদ্র্যের অবধি নাই। তাঁহাদিগের নিজ নিজ ভদ্রাসন—পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে এতকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়াছিলেন—তাহাও এখন বন-জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে। জলসরবরাহ একবারেই বন্ধ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অসংখ্য গ্রাম একসঙ্গে উজাড় হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত লোক কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহারা আপনাদের পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া সহরে চাকুরী খুঁজিতেছে। অনেক গ্রাম এরূপে এখন একেবারেই লোকশূন্য। যে সকল গ্রামে প্রায় কুড়ি ত্রিশটি টোলে শাস্ত্রজ্ঞগণ অধ্যাপনা করিতেন, বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রেরা আসিয়া যেখানে শিক্ষালাভ করিত, যে গ্রাম "বারো মাসে তের পার্ব্বণে" মুখরিত থাকিত, যেখানে দুর্গা ও কালীপূজার সময় প্রায় দুই শত বাড়ীতে মহোৎসব হইত, বারোয়ারী পূজার বিপুল সমারোহ জনসাধারণের হৃদয়ে বল এবং মনে আনন্দ সঞ্চার করিত, হরিনাম কীর্ত্তন, রামায়ণ এবং চণ্ডীর গান জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীকে আরও মধুর করিয়া তুলিত সে গ্রাম এখন নিস্তব্ধ, নিরানন্দ—শৃগাল ব্যাঘ্রের রঙ্গভূমি। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন কোন এক ভীষণ মহামারী গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মাঝে মাঝে বনজঙ্গলের ভিতর হইতে দুই একটা পতনোন্মুখ কোঠাবাড়ী পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি বহন করিয়া পথিকের মনে ভীতি

এবং বিষাদ সঞ্চার করিতেছে। যে সকল গ্রাম একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদিগেরও ক্রমাবনতি হইতেছে। অধিকাংশ গ্রামের কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবিগণকে অন্নাভাবে অনশনে থাকিতে হয়। কৃষকগণের সমস্ত পরিশ্রম জমিদারের খাজনা এবং মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেই ব্যয়িত হয়। একবার ঋণ গ্রহণ করিলে সে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশেষে আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় বহন করাও কঠিন হইয়া পড়ে। অন্নাভাববশতঃ কৃষকদিগের রোগাধিক্য এবং পরিশ্রমকাতরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার সঙ্গে বার্ষিক দুর্ভিক্ষ, জলাভাব, গোবংশের অবনতি এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস জড়িত হইয়াছে, কাজেই কৃষকদিগের দুর্গতির সীমা নাই। শিল্পজীবিগণকেও দারিদ্র্য হেতু পাইকার প্রভৃতির নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয় অ্যাযাদরে তাহাদিগের দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা নাই বলিয়া তাহারা পরিশ্রমোপযোগী ফল লাভ করিতে পারে না। উপরন্তু, বিদেশ হইতে পল্লীর হাট বাজারে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের আমদানী হইয়াছে গ্রাম্য দ্রব্যের আদর কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর প্রভাবে কাঠ, পিত্তল, মাদুর এবং মাটীর কাজ ব্যতীত সমস্ত শিল্পই প্রায়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাকুরীর লোভে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য সহরে আসিতেছেন, চাকুরী পাইলে তাঁহারা ভ্রমক্রমেও নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন না। জমিদারবর্গ নানা কারণে ভোগবিলাসের লীলাভূমি নগরীতে আসিতে বাধ্য হন—এবং ক্রমশঃ আপনাদিগের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান। প্রজাদিগের

উন্নতির জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ উৎসাহ থাকে না। সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং ধনী সম্প্রদায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে দলাদলি, বিবাদ, মামলা, মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের গুরুস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদিগের অবর্ত্ত-মানে, নৈতিক শিক্ষার অভাবে, জনসাধারণের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই চাকুরীজীবী অথবা চিরপ্রবাসী; এবং জনসাধাণ –যাহা লইয়াই দেশের সমাজ এবং দেশেব বল—রুগ্ন, দুর্ভিক্ষপীড়িত, ঋণভারগ্রস্ত, চিরদারিদ্র্যকে একমাত্র সখা করিয়া কালাতিপাত করিতেছে।

রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ॥

বাস্তবিক বাঙ্গালীসমাজ এরূপ জীবন যাপনে কতদিন সন্তুষ্ট থাকিবে?

পল্লীসেবকের কর্ম্মক্ষেত্র।

যে সমাজে এই সমস্ত বিপুল অভাব সেখানে দুই একজন ভাবুক, কর্ম্মী, বা দুই একটী শিক্ষাপরিষৎ বা সাহিত্য-পরিষৎ কি করিবেন! এখন পল্লীতে পল্লীতে কর্ম্মোপাসক ভাবুকের প্রয়োজন, গ্রামের হাটবাজারে পল্লীসেবকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রয়োজন। দুঃখের কথা—আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা রব উঠিয়াছে—"দেশের কাজ করিবার সুযোগ কোথায়?"

তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রই খুঁজিয়া পান না! বড়ই অনুতাপের বিষয় এই যে – তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা এবং কতকগুলি হুজুগ সৃষ্টি করাই দেশের কাজ মনে করেন। অথচ সমাজব্যাপী দেশভরা এতগুলি অভাব রহিয়াছে। স্থিরভাবে সংযতভাবে ব্যক্তিগত ভাবে সেগুলি পূরণ করা যাইতে পারে। তাহাতে সকলেরই সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কোন বিঘ্ন বা বাধা পাইবার কারণ নাই।

শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন পল্লীতে বাস করিতে হইবে, হাটে হাটে ভ্রমণ করিতে হইবে। পল্লীসমাজে দেশবিদেশের ব্যবসাবাণিজ্য এবং শিল্পকৃষিকর্ম্মের কথা শুনাইতে হইবে, তাহাদের আর্থিক, নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা নানা উপায়ে উন্নত করিতে হইবে। গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নতির নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। *চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী স্বদেশসেবকগণ গ্রামের ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য যত্নবান হইবেন। গ্রামের পুষ্করিণীগুলি প্রতিবৎসর সংস্কৃত করাইতে হইবে। নদীর গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইবে। যেখানে কৃষকেরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছে, সেখানে গিয়া তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া কৃষকের কর্ম্মে সাহায্য করিতে হইবে। চাষ-আবাদের কি কি অসুবিধা আছে, তাহাদিগের হালের গরু এবং যন্ত্রাদির কিরূপ অভাব, জলসেচনের ব্যবস্থা কিরূপ, শস্যসমূহের বীজসংগ্রহ এবং সংসারের ব্যবস্থা কি প্রকার —এই সমুদয় তথ্য অবগত হইয়া চাষীদের মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যা প্রয়োগ করিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে খাঁটি

কৃষক হইতে হইবে। গ্রামে মহাজনের অত্যাচার আছে কি না; গ্রামের কত জন কৃষক ঋণভারগ্রস্ত, কত জন লোক মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; গ্রামের সুদের হার কত, কিস্তিখেলাপী সুদ কিরূপ, গ্রামে সওয়া, দেড়ী, বাড়ী প্রভৃতি কিরূপ প্রচলিত; গ্রামের পাইকার আড়ৎদার কিরূপ দাদন দিয়া থাকে, এই সকল অবস্থা বুঝিয়া ধনবিজ্ঞানের উপদেশগুলি গ্রাম্য সমাজে কাজে লাগাইতে হইবে।

যাঁহারা শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিখিয়া পণ্ডিত হইতেছেন তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য এখন এই সমুদয় তথ্যসংগ্রহে এবং গ্রাম্য জীবনের উন্নতি বিধানে প্রয়োগ করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সহরে বসিলে দেশীয় সমাজে বিজ্ঞানপ্রচার, শিল্পপ্রচার, ব্যবসায়-প্রচার হইবে না। এখন বিজ্ঞানবিদ্‌গণকে স্বয়ং গ্রামে বসিয়া কৃষকের অসম্পূর্ণতাগুলি সম্পূর্ণ করিতে হইবে—হাতেকলমে কাজ দেখাইয়া শিল্পীদিগকে উন্নত শিল্প প্রণালীর প্রবর্ত্তনে উৎসাহিত করিতে হইবে।

সহানুভূতি এবং সাহচার্য্য হইতেই প্রকৃত পরিচয় জন্মে, এই কারণে গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় লাভ করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহাদিগের চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রণালী আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পল্লীবাসীদিগের অসংখ্য অভাব অভিযোগ, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। গ্রামের সমস্ত কৃষক, সমস্ত শিল্পী, সমস্ত শ্রমজীবীর নিকট হইতে তাহা-

দিগের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিতে হইবে—পরিবারের মধ্যে কয়জন উপার্জ্জন করে, স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন আছে কি না, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনে পরিবারের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি না, যদি কর্জ্জ করিয়া থাকে ঐ কর্জ্জ কত বৎসরের, কর্জ্জের কারণ কি, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় ব্যয়ের জন্য কি না, যদি পরিবারের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে উহা কিরূপে খরচ হয় : সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, যৌথ-ঋণদান মণ্ডলী বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় কি না। গ্রামের হাটে হাটে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে পল্লীর হাটে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, সে সমস্ত দ্রব্য পল্লীগ্রামেই প্রস্তুত হইতে পারে কি না, গ্রাম হইতে শস্যের রপ্তানি কি পরিমাণে হয় ; উহার সঙ্গে পল্লীগ্রামের দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। প্রত্যেক মণ ধান পাট, গম, বুট, সরিষার জন্য কৃষক অথবা পাইকারগণ কত লাভ করে ; গ্রামে জমি বন্ধক দিবার জন্য কি প্রণালী অনুসৃত হয়, খায়খালাসী, কটকবালা প্রভৃতি কিরূপ প্রচলিত ইত্যাদি নানা বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। যেখানে জোলা, তাঁতী, ভাস্কর, কাঁসারী তাহাদিগের আপনাপন কুটিরে বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাদের উপকরণ-সামগ্রী কিরূপ মূল্যে ক্রয় করে ; তাহাদিগের প্রস্তুতদ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয় হয় কি না, পাইকারেরা তাহাদিগের দ্রব্য সহরে বিক্রয় করিয়া কিরূপ লাভ করে ; তাহাদিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য সহরের ধনী

এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিরূপ সাহায্য করিতে পারে। তাহার পর প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডলের নিকট সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে গ্রামে দলাদলি আছে কি না, মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে, গৃহবিবাদ, গ্রাম্যবিবাদ প্রভৃতি মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার ঐ কার্য্যে কি উপায়ে সহায়তা করা যায়। গ্রামের নৈতিক অবস্থা কিরূপ, গ্রামে কতজন মদ্য পায়ী, তাড়িখানার সংখ্যা এবং আবগারীর আয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে, মদ্যপান নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত। এইরূপে নানাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসেবকগণকে বিভিন্নপ্রকার বৈষয়িক এবং সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

পল্লীগ্রামের চিন্তাজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার জন্য প্রাচীন পুঁথি, কুলজী গ্রন্থ, প্রাচীন গীত, ছড়া বচন, জনপ্রবাদ প্রভৃতি সঙ্কলন করিতে হইবে। পল্লীসমাজের আমোদ প্রমোদ, ধর্ম্মকর্ম্ম, মেলা উৎসব প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে সরসতা ও সজীবতা প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর লোকশিক্ষার জাতীয় প্রণালী বুঝিতে হইবে; কথকতা, যাত্রা এবং কবিগান, রামমঙ্গল গান, চণ্ডীগান, হরিনাম এবং গৌরনিত্যানন্দ নাম কীর্ত্তন প্রভৃতিতে বাঙ্গালার পল্লীসমাজে কেমন আনন্দের ভিতরদিয়া শিক্ষা প্রচারের বিপুল আয়োজন হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রচাররীতি বজায় রাখিয়া ইহাদের বিষয় ও প্রণালী সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায় কি না তাহা

ভাবিতে হইবে। গ্রামে কোথায় কোন ভাল কথক, কবি যাত্রা-ওয়ালা অথবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সামান্য কুটিরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কালাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগের সংবাদ লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে লোক-শিক্ষা-প্রচার-কার্য্যে যথাসম্ভব নিযুক্ত করিতে হইবে। যাহারা ঘরে ঘরে হরিনাম করিয়া 'ঠাকরুণ বিষয়' রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়া আসিতেছে, সেই ভিক্ষুক ভিখারীদের ভিক্ষাবৃত্তি পল্লী-সমাজের আধ্যাত্মিক বোধকে সজীব রাখিয়া যাহাতে আরও সার্থক হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

যেখানে কৃষক লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে গান ধরিয়াছে, "মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা"; যেখানে তাঁতী কাপড় বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে "ওহে হর, এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ খুব ভালই জান," যেখানে মাঁঝি নদীর স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া উদাস প্রাণে গাহিতেছে "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাহিতে পারি না,"—তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের ভক্তি এবং প্রেমের গভীরতা বুঝিতে হইবে। তাহাদের নিকট সরলতা, ভক্তি ও তন্ময়তা শিখিতে হইবে। গম্ভীরার গান, ভাটিয়াল গান, বিষহরির গান, রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীসম্বন্ধীয় গান ইত্যাদি সকল প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

গ্রামে যে মুদী প্রত্যহ দোকানে আলো জ্বালিয়া তাহার মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের নিকট সীতা, সাবিত্রীর দুঃখ কাহিনী, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, বেহুলার নিষ্ঠা এবং 'যবন' হরিদাসের অটল ভক্তির কথা শুনাইয়া

তাহাদিগকে ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত করিতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই সহজ সরল ধর্ম্মজীবনের ভিতরকার সুরটির সহিত আমাদিগের সুর মিলাইতে হইবে।

আমাদের ভবিষ্যৎ

এই উপায়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত যখন জনসাধারণের গভীরতর ভাব-বিনিময় হইতে থাকিবে, তখন শিক্ষিত সমাজ আপামর জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ, ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি আর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন না। তখন তাঁহারা বুঝিবেন, পল্লী-সমাজই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অন্তঃস্থল। যুগ-যুগান্তকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের উপর যে চিন্তাস্রোত অব্যাহতভাবে বহিয়া আসিতেছে সে স্রোত সহরের আফিস আদালত কলকারখানার মধ্যে আবিল এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পল্লীসমাজে এখনও তাহা নিরাবিল এবং প্রবল। এই জাতীয় প্রাণ ধারার সহিত যতই তাহারা আপনাদিগের প্রাণের যোগ অনুভব করিবেন, ততই পল্লীজীবনের শান্তি, সরলতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং আনন্দ তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের এক অপূর্ব্ব সম্পদ বলিয়া বোধ হইবে। পল্লীসমাজের সমাদর আরম্ভ হইলে পল্লীজীবনে গৌরব-বোধ জন্মিবে, তাহার ফলে সমগ্রসমাজ ভাবুকতার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িবে। দেশের সর্ব্বত্র শীঘ্রই একটা বিপুল আন্দোলন সৃষ্ট হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন প্রকৃত জন-নায়কগণ দেখা দিবেন। জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য মোচন এবং শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ইহাদিগের পিতা স্বরূপ হইবেন,—

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥

অসংখ্য জনসাধারণের সমস্ত আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ এই জন নায়কগণের জীবনে অভিব্যক্ত হইবে। কত শত বৎসর ধরিয়া সমাজে যে বেদনা অব্যক্ত ও অস্ফুট ছিল তাহা এখন প্রকাশের সুযোগ পাইবে। এত দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জগতের নিকট যে বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করিতেছিল তাহা এখন সার্থক হইবে। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কৃষিশিল্পবিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানাগার খোলা হইবে এবং সমবেত প্রণালীতে কৃষি ও শিল্পকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকিবে। লোকশিক্ষা এবং সমবায়-অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন চলিতে থাকিবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভারতবর্ষের পল্লীবাসীর দারিদ্র্য মোচন করিবে। ভারতীয় পল্লী-বাসীর আধ্যাত্মিক জীবন তখন নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই। এজন্য সাম্য-নীতিমূলক সমাজ-তন্ত্র এবং অতীন্দ্রিয়ভাবাপন্ন সাহিত্য ও চিত্রকলার দ্বারা পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সমাজের প্রতিযোগিতা, অনৈক্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু কারল্ মার্কস্ ও এঞ্জেলস্, রস্কিন এবং মরিশ প্রভৃতি কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণ ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কার এবং পরিশোধন কার্য্যে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ভারতবর্ষের পল্লীসেবকগণকে সেই

কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পারদর্শী ভারতবর্ষের পল্লীসেবক বিজ্ঞান সাহায্যে ভারতীয় পল্লীজীবনের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিয়া এক বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া দিবেন। এই আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সামাজিক জীবনে সুখশান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে।

বিশ্ব-দেবতা ভারতবর্ষের পল্লীসেবককে উপলক্ষ্য করিয়া মানব-জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন।

একাদশ অধ্যায়

পল্লী-সভ্যতার পুনরুত্থান

অস্বাস্থ্যতা

কলিকাতার সাহিত্যসম্মিলনে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি পল্লীর স্বাস্থ্যের দিকে আমাদিগকে মন দিতে বলিয়াছিলেন। সাহিত্যাচার্য্য সরকার মহাশয় অভিভাষণের একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পল্লীবাসী সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে আমি যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে প্রধানতঃ প্রজার দারিদ্র্যের কথা বলিয়াছি, দেশ যে বিষম অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, একথা ভাল করিয়া বলি নাই। সরকার মহাশয় রোগ-পীড়িত দেশবাসীদিগের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রনার কথা সাহিত্যসেবিগণকে বৎসর বৎসর শুনাইতেছেন, তাঁহার করুণাপূর্ণ হৃদয়ের গভীর বেদনা তাঁহার অভিভাষণে ফুটিয়া উঠিয়া প্রত্যেক বৎসরই আমাদের হৃদয়ে একটা উদ্বেগ আনিয়াছে।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-বৃদ্ধি যে বাঙ্গালার গ্রামগুলির অবনতির প্রধান কারণ, আর সেই কারণ দূর করিতে না পারিলে যে পল্লীরক্ষার কোনও উপায়ই করা যাইবে না, একথা আমি ভাল করিয়া বলি নাই বলিয়া তাঁহার দুঃখ।

আমি তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছি বলিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি। আমার নিজের কথা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিলে বোধ হয় আমি তাঁহার দুঃখের কারণ হইতাম না।

উপসর্গ

আমার মনে হয়, দেশের অস্বাস্থ্যতাই যে দেশের প্রধান শত্রু বলিয়া এক্ষণে বোধ হইতেছে, এবং পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেই যে পল্লীরক্ষা হইবে, তাহা ঠিক নহে। দেশের প্রতি পল্লীগ্রামই যে এক্ষণে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, তাহার কারণ প্রাকৃতিক নহে, এক একটা ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামেও আবদ্ধ নহে। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া একটা সামাজিক বিপ্লব চলিতেছে—যাহার ফলে আমাদের পল্লীগ্রামে স্বাতন্ত্র্য যে শুধু লুপ্ত হইতেছে তাহা নহে, পল্লীজীবন নাগরিক জীবনের পুষ্টিবিধানের জন্য একেবারে বিসর্জ্জিত হইতেছে। সমাজের একটা অঙ্গ আর একটা অঙ্গের রক্ত শোষণ করিতেছে,—পল্লীর অস্বাস্থ্য সে ত মৃত্যু-রোগের একটা উপসর্গ মাত্র। উপসর্গ নিবারণের জন্য চিকিৎসা না করিয়া আসল রোগকে দূর করিতে হইবে।

নাগরিক আদর্শের প্রাবল্য

আমাদের আধুনিক সভ্যতায় এখন কি দেখিতেছি;—পল্লী কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম নাগরিক জীবনকে পুষ্ট করিতেছে, দেশবাসিগণের অভাব সম্পূর্ণ মোচন না করিয়া অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সাহায্যে

বিদেশের অভাব মোচন করিতেছে অথবা বিলাসিতার উপকরণ জোগাইতেছে, পল্লীর শিক্ষা পল্লীজীবন সংগঠনের উপায় না হইয়া নাগরিক জীবন গঠনের উপাদান সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছে, দেশের সমস্ত ধীবুদ্ধিশক্তিকে এক ভাবে নিয়োজিত করিয়া নাগরিক ব্যক্তিত্বকে গঠন করিতেছে, এমন কি আমাদের সাহিত্যের আধুনিক ভাব ও আদর্শ নাগরিক শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সমগ্র জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন জীবন বিকাশের অন্তরায় হইতে চলিয়াছে। ইহার ফলে পল্লীর জীবনীশক্তি যে হ্রাস পাইবে তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু নাগরিক জীবন যে পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাও নহে,—বিদেশীয় সভ্যতানুমোদিত কৃত্রিমতা ও বিলাসিতার অত্যাচারে, ব্যয়-সাপেক্ষ মিউনিসিপালিটি সমুদয়ের করস্থাপনের গুরুভারে, অন্ন সংস্থানে পরাধীনতায়, দেশীয় শিল্পীব্যবসায়ীদিগের দৌর্ব্বল্যে, বিদেশীয় বণিকদিগের প্রাবল্যে নাগরিক জীবনও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

এই ত আমাদের অবস্থা। পল্লী রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান সমাজের গোড়া পত্তন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, আধুনিক সমাজের ভাব ও আদর্শ কাজও কর্ম্মের বিপ্লবসাধন করিতে হইবে। যে চিন্তা ও কর্ম্মের প্রভাবে আমরা কেবলমাত্র নাগরিক ব্যক্তিত্বের পুষ্টিবিধান করিতেছি, সর্ব্বাঙ্গীন নাগরিক ব্যক্তিত্ব নহে, একটী দীনহীন নিকৃষ্ট ব্যক্তিত্বকে সমাজের আদর্শরূপে স্থাপন করিতেছি, যাহাদের প্রভাবে আমরা নগরের আফিস আদালত সেরেস্তায় দেশের মনুষ্যত্বকে নায়েব সেরেস্তাদার বড় বাবুর হাতে গড়িতে দিয়াছি, পল্লীগ্রামের অন্ন পল্লীগ্রামে সঞ্চয় না করিয়া বিদেশী বণিকদিগের হাতে অফুরন্ত

তুলিয়া দিতেছি, পল্লীগ্রামের উপকরণ দ্রব্য সামগ্রী সমুদয় ব্যবহার করিবার জন্য কারখানা স্থাপন না করিয়া বিদেশের কারখানায় পাঠাইয়া দিতেছি, দেশের স্বাভাবিক গমনাগমন ও বাণিজ্যপথ নদনদী খালগুলিকে চক্ষের সম্মুখে শুষ্কপ্রায় হইতে দেখিয়াও বহির্বাণিজ্যের প্রশস্ত রেলপথ নির্ম্মাণে আনন্দে অধীর হইতেছি,—পল্লীবাসী কৃষিজীবিগণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বাধ্যকরী লোক শিক্ষা-বিধির নামে করতালি দিতেছি,—সে চিন্তা ও কর্ম্ম লোপ না পাইলে সমাজের মঙ্গল নাই, নগরের গৌরব নগরবাসীদের হীনতা, এবং পল্লীর দুঃখ দারিদ্র্য দেশবাসিগণের মোহান্ধতার স্থায়ী চিহ্ন থাকিবে—নগরে দুই একটা বঙ্গলক্ষ্মীমিল বা হিন্দুস্থান কোম্পানী সে হীনতাকে দূর করিতে পারিবে না, পল্লীগ্রামে দুই একটা পল্লী-পরিষৎ বা সেবাশ্রম সে দুঃখদারিদ্র্যমোচন বা স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে পারিবে না।

পল্লীপরিষৎ গঠিত হউক, সেবাশ্রম স্থাপিত হউক, স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা হউক, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হইবে—যতক্ষণ আমরা সমাজের আধুনিক ব্যবস্থা, চিন্তা ও কর্ম্মের গতির পরিবর্ত্তন করিতে না পারি। আমরা শিক্ষা, দীক্ষা, অন্নসংস্থানের জন্য নগরে যাইতেছি, আমরা গ্রামে বাস করিলে 'চাষা' থাকিব, সভ্যতার আদব কায়দা শিখিবার জন্য নগরে যাইতেছি,—এক্ষেত্রে গ্রাম বনজঙ্গল-পরিপূর্ণ, অস্বাস্থ্যকর ত হইবেই, নগরের অধিষ্ঠাত্রী বিদেশিনী ডাকিনীর কুহক হইতে যতদিন না আমরা পলাইতে পারি, ততদিন জ্বর রাক্ষস আমাদের রক্ত শোষণ করিবেই।

গ্রামে স্বাধীন অন্নসংস্থানের আয়োজন

নগরের চিন্তা ও কর্ম্মকে এখন গ্রাম্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে দেওয়া হইবে না। গ্রাম্য সাহিত্য, গ্রাম্য আচার ব্যবহার, গ্রাম্য শিল্প বাণিজ্যের এখন উন্নতি সাধনের চেষ্টা দেখিতে হইবে। নাগরিক ব্যক্তিত্বের হীন আদর্শকে এক্ষণে খর্ব্ব করিতে হইবে। প্রধানতঃ গ্রামে অন্নসংস্থানের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সমগ্র সমাজ নাগরিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আর লালায়িত হইবে না—মধ্যবিত্ত সমাজ এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে, পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সে স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় হারাইয়াছে। নগরে চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া তাহার অর্থ গিয়াছে, বল গিয়াছে, সাহস গিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা গিয়াছে। শুধু কৃষক মজুর নহে মধ্যবিত্ত সমাজও দারিদ্র্যের কঠোরতা কিরূপ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে। এক্ষণে পল্লীগ্রামে স্বাধীন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিলে মধ্যবিত্ত সমাজ একটা নিকৃষ্ট নাগরিক ব্যক্তিত্বের আদর্শের দ্বারা আর পরিচালিত হইবে না। নিজবাসভূমি ত্যাগ করিয়া প্রবাসী হইবে না।

যে বিজ্ঞানের দ্বারা পল্লীবাসিগণ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া আপনাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা ও তাহার পুষ্টিবিধান করিতে পারে তাহার নাম সমবায়। পল্লীবাসিগণ সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, এবং মধ্যবিত্ত সমাজ পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তাহাদিগকে এ বিষয়ে পরিচালিত করিলে—শুধু জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ পরিষ্কার, পুষ্করিণী খনন, বনজঙ্গল পরিষ্কার কেন, উপযোগী শিক্ষা ও স্বাধীন

অন্নসংস্থানেরও ব্যবস্থা হইবে। কি উপায়ে সমবায় পদ্ধতি আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাধীন অন্নসংস্থান ও কৃষি গৃহশিল্পের উন্নতিবিধান করিতে পারে, তাঁহা আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পল্লীগ্রামেই দেশের ভদ্রসন্তানগণের জন্য স্বাধীন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে পল্লীরক্ষা অসম্ভব। বাটীতে নিজে না থাকিলে বাটী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অসম্ভব। কয়েকজন দেশহিতৈষীদিগের উপর বনজঙ্গল পরিষ্কার ও গৃহরক্ষার ভার দিয়া রাখিলে গৃহ রক্ষিত হইবে না। ভারতবাসীর গৃহ ত পল্লীগ্রাম। ভারতবাসী যাহাতে রোগ দুঃখে গৃহত্যাগী না হয়, তাহার জন্য সমবায় বিজ্ঞান প্রচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শুধু পরহিতৈষণার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, নিজ বাসভূমে যাহাতে অন্নসংস্থানের সুবিধা হয় তাহা করিতে হইবে। সমাজ অনশনে থাকিয়া কথনও শুধু পরহিতৈষণা হইতে প্রাণ পাইতে পারে না।

পল্লীজীবনের মূলভিত্তি

অনেকে বলিতেছেন, সভ্যতার ইতিহাসে নগর গ্রাম অপেক্ষা অধিক ক্রমোন্নতি লাভ করিবেই, গ্রাম ক্রমশঃ সমাজ-গঠনে অপেক্ষাকৃত কর্মপ্রভাব বিস্তার করিবে; এ ক্ষেত্রে নগরের উন্নতির প্রতিরোধ হইলে সভ্যতার হানি হইবে। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, নগরের উন্নতি যখন অবশ্যম্ভাবী ও অত্যাবশ্যক পল্লীগ্রামগুলিকে নগরের মতন গড়িয়া তুলা হউক। তাহা হইলেই সমগ্র সমাজ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

এই সকল বিষয়ের সম্যক আলোচনা আমাদের দেশের শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় কেন সকলের পক্ষেই এক্ষণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। পল্লীগ্রাম দুই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—একটা প্রাকৃতিক ভিত্তি, জমি আর একটা সামাজিক ভিত্তি—ভূমির উপভোগকারী ভূমিতে আবদ্ধ একান্নবর্ত্তী পরিবার। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত একান্নবর্ত্তী পরিবার রক্ষা করা কঠিন হয়, ভূমি ছাড়িয়া লোকের অর্থের উপর অধিক ঝোঁক হয়—ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নগরের আবির্ভাব। নগরে যৌথপরিবারের মর্য্যাদা লোপ পায়, ভূমিস্বত্বের গৌরবহানি ও অর্থস্বত্বের গৌরব বৃদ্ধি দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজ-বন্ধন এক্ষণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে,—ইউরোপে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই বলিলেও চলে, এমন কি স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধও খুব শিথিল হইতেছে। জার্ম্মাণীতে স্ত্রীবর্জ্জন এত বেশী হইয়া পড়িতেছে যে, একজন গণনা করিয়াছেন যে ৩৫ বৎসর পর জার্ম্মাণীতে এমন কোন বিবাহিত পুরুষ থাকিবে না যে একবার না একবার একজন স্ত্রীকে না ত্যাগ করিয়াছে। এই ত গেল পরিবারের কথা। ভূমিস্বত্বের দিকে চাহিলেও আমরা দেখি,—ইংলণ্ডে প্রজাদিগের ছোট ছোট জমি নাই বলিলেও চলে—ডিউক মারকুয়িস শিকারের জন্য জমি রাখিয়াছেন, বড় লোক জমিদার হইবার জন্য জমি রাখিয়াছেন, ব্যবসায়ী অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কে অর্থ জমা দিয়া নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবার জন্য জমি রাখিয়াছেন—শুধু কৃষকের ভূমিস্বত্ব সমাজ সম্মান করে না—তাই গভর্ণমেণ্ট Small Holdings Act করিয়া কৃষককে

ক্ষুদ্রাকার ভূমিতে স্বত্ব দিতে চাহিতেছে—ইংলণ্ডে তিন একার জমি ও একটি মাত্র গরুর (three acres and a cow) অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন চলিতেছে,—কৃষকগণ যাহাতে ক্যানাডা, নিউজীলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া না যাইয়া ইংলণ্ডের ভূমিকর্ষণ করে তাহার জন্য (Colonisation of England) আন্দোলন চলিতেছে। Bannerman, Lloyd George, Masterman এর আশা কবে পূরণ হইবে কে বলিতে পারে !

আবার যে ইংলণ্ডে পল্লীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে, সেই ইংলণ্ডেই নগরের অত্যধিক উন্নতি।

প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক কারণে ইংলণ্ড ইউরোপের মধ্যে শিল্পব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, কিন্তু শুধু শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির জন্য পল্লীগ্রামের অবনতি হয় নাই—ইংলণ্ডে উত্তরাধিকার ও enclosure বিষয়ক আইন, অবাধ বাণিজ্যনীতি, অক্ষম গরীবদিগের জন্য পুরাতন আইন, শিকার বিষয়ক আইন প্রভৃতি ধীরে ধীরে জমিস্বত্বহীন শ্রমজীবীদিগের সৃষ্টি করিতেছে—তিন একার জমি ও একটা গরুর অধিকার হইতে কৃষককে বঞ্চিত করিয়াছে।

ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের দুই ভিত্তির উপরই কুঠারাঘাত পড়িয়াছিল। তাই সেখানে পল্লীগ্রামের এত অবনতি। পক্ষান্তরে শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি হেতু নগরের উন্নতি।

কৃষকের ভূস্বত্ব হানি

আমাদের দেশের প্রজারা এখনও তাহাদের ক্ষুদ্র জমি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, দেশের প্রজাদিগের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যে ভূমিস্বত্ব ছিল তাহা হইতে তাহারা যে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তবুও তাহারা ভূমিস্বত্বের ছায়াটুকু লাভ করিয়া সন্তুষ্ট আছে, জমি চাষ করিয়া কিছু ফসল তুলিয়া লাভ করিতে পারে, ইংলণ্ডের কৃষকের মত তাহাদের অবস্থা এখনও হীন হয় নাই। পল্লীজীবনের যাহাকে আমি প্রাকৃতিক ভিত্তি বলিয়াছি তাহার মূলোচ্ছেদ হয় নাই।

আমাদের কৃষকের ভূমিস্বত্বের এই ছায়াটুকু যদি লোপ পায় তাহা হইলে আমাদের পল্লীর অবনতি অনিবার্য্য। জমিদার যদি জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারে—তাহা হইলে কৃষক দিনমজুরে পরিণত হইবে—হয় কৃষির অবনতি হইবে—না হয় হাজার দুহাজার বিঘা জমি এক সঙ্গে কর্ষিত হইবে, এক বিঘা দুই বিঘা জমি চাষ উঠিয়া যাইবে, ধনীর খুব ধনবৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইবে—সমাজের একদিকে ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা আর একদিকে দারিদ্র্যের নীরব বেদনা আমরা তখন চক্ষের সম্মুখে দেখিব।

যৌথপরিবারের অমর্য্যাদা

পল্লীজীবনের সামাজিক অথবা মানসিক ভিত্তি একান্নবর্ত্তী পরিবার। ইংলণ্ডে Primo-geniture আইন অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র

পিতার সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারী—অন্য পুত্রের পিতার সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব নাই। ইংলণ্ডে আইনই একান্নবর্ত্তীপরিবার-বিরোধী। ইহাতে এক দিকে যেরূপ পরিবারের মধ্যে কেবল একটি মাত্র নির্ব্বোধ পুত্রের সৃষ্টি হইতে পারে, বাকী পুত্রেরা সম্পত্তির কোন অংশ না পাইয়া স্বকীয় বুদ্ধি ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া সমাজের ধন বৃদ্ধির সহায় হয়; অপর দিকে সেইরূপ সমাজে দ্বন্দ্বেরও সূত্রপাত হয়—যাহারা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় তাহারা মনে করে সমাজ তাহাদিগের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অন্যায় বিচার করিয়াছে,—ইহা সমাজের পক্ষে ঘোর অকল্যাণপ্রদ।

আমাদের দেশের আইন কানুন একান্নবর্ত্তী-পরিবার রক্ষারই পক্ষপাতী। বরং হিন্দু আইন অনুসারে জমি অনেক সময়ে অনেক সন্তান সন্ততির ভাগে ফসল উৎপাদনের অসুবিধা ঘটে। বিশেষতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে উত্তরাধিকার বিধি অনেক সময়েই ধনসম্পত্তি বিভাগের অত্যধিক প্রশ্রয় দিয়া বৈষয়িক উন্নতির অন্তরায় হয়।

নানা কারণে আমাদের যৌথ-পরিবারের মর্য্যাদার ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। হাইকোর্টের আইনকানুনও একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি যেরূপ একান্নবর্ত্তীপরিবার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রধান কারণ, আমাদের সমাজে সেরূপ চাকুরী যৌথপরিবারের বন্ধন মোচনের প্রধান কারণ হইয়াছে। ইউরোপে নগরে যেরূপ শিল্পব্যবসায়ের কেন্দ্র; আমাদের সমাজে সেরূপ ইহা চাকুরীর স্থান। ইউরোপে নগর স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের আবাসভূমি; আমাদের সমাজে নগর

মুখ্যভাবে স্বাধীনচিন্তা ও কর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক নহে। কিন্তু নানা মতাবলম্বী বিভিন্ন লোকে একত্রে অবস্থান করে বলিয়া নগরই স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের উৎসাহ প্রদান করিতেছে। কিন্তু তাহা করিতেছে গৌণভাবে। নগর যে ব্যক্তিত্ব গঠন করিতেছে তাহা দীনহীন পরমুখাপেক্ষী. ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

অনুকরণের মোহ

আমরা সব দিকেই বিপরীত পথে চলিয়াছি। আমাদের কৃষকের যে পূর্ব্বে ভূমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাহা আমরা এখন স্বপ্নাতীত মনে করিতেছি,—কৃষক যে ধীরে ধীরে আপনার ভূমিস্বত্ব হারাইয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়াছি। যে স্বত্ব তাহার এখনও আছে আমরা ভাবিতেছি উহা জমিদারের অযাচিত দান। ভূমির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী. ভূমিতে আবদ্ধ কৃষক পরিবার যে সমাজের সর্ব্বপ্রধান বল ইহা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, আধুনিক জার্ম্মাণজাতি তাহা চক্ষের সম্মুখে দেখাইতেছে। আমরা সে সত্য মানিতেছি না। সমাজের স্থিতি উন্নতির প্রধান সম্বল কৃষকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আমরা দৃকপাত করিতেছি না, সে তাহার ভূমিস্বত্ব হারাইতেছে নীরবে, নির্ব্বিবাদে,—কেহই তাহার জন্য কোন কথা বলিবে না, কোন উদ্বেগ প্রকাশ করিবে না।

আমরা নগরে ছুটিতেছি,—আমাদের শস্যপূর্ণ দেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন জীবিকার আবাসস্থল ছাড়িয়া,— শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির দ্বারা সমাজের ধনবৃদ্ধির জন্য নহে

দুর্ব্বলতা ও পরমুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃতির অযাচিত দান উদার উন্মুক্ত আলোক বাতাস নীলাকাশ ছাড়িয়া আমরা মোহের তাড়নায় একটা অস্পষ্ট অস্বাভাবিক সভ্যতার আলোককে চরম লক্ষ্য করিয়া নগরে ছুটিয়া আসিয়াছি,—আমাদের সভ্যতার অভ্যন্তরীণ আলোক যে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে তাহা এতদিন পরে বুঝিয়াছি,—

"পর দীপশিখা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুকরণ

আমরা অনুকরণপ্রিয়, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া নগরে আসিয়া পৌছিয়াছি। আমরা পাশ্চাত্য সমাজকে অনুকরণ করিতেছি। কিন্তু কবেকার পাশ্চাত্য সমাজ? বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজ নহে, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজের ভাব ও আদর্শকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। একটা শতাব্দী যে চলিয়া গেল তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। চীনদেশের ইতিহাসের এক শতাব্দী নহে, উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য সভ্যতার এক শতাব্দী অসংখ্য ভাব ও ঘটনাপুঞ্জের উপহার দিয়া গেল, আমরা তাহা উপেক্ষা করিয়াছি।

প্রাচীন ও নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতার তারতম্য

পাশ্চাত্য সমাজে এক শতাব্দীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখা গিয়াছে। সে প্রভেদ কি হইয়াছে তাহা এক কথায় ইঙ্গিত করা

কঠিন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানবিদের মত যদি বলি. শ্রমশক্তি ধনশক্তির সংঘর্ষ এ বিপ্লবের মূলে তাহা হইলে ঠিক বলা হয় না ; রাষ্ট্রনীতির উপদেশ গ্রহণ করিয়া যদি বলি এই বিপ্লবের মূলে—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব প্রসূত আধুনিক ভাবও আদর্শের সহিত মধ্যযুগের আদর্শ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের বিরোধ তাহা হইলে আরও ভুল বলা হইবে। সত্য বলিতে গেলে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজে বিজ্ঞান ও ব্যবসায়মূলক সভ্যতার প্রথম যুগ দেখা গিয়াছে। সে যুগের লক্ষণ সমাজের উপর বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের অত্যাচার। ইহা নানা আকার ধারণ করিয়াছে,—শ্রমজীবীর উপর ধনীর নির্য্যাতন, মনুষ্যের উপর কলের নির্য্যাতন, বিজ্ঞানের নির্য্যাতন, অর্থের নির্য্যাতন, আর্টনীতি ও ধর্ম্মের নির্ব্বাসন-- সকল দিকেই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অসামঞ্জস্য, অশান্তি,—বিজ্ঞান ও ব্যবসায় প্রবলপরাক্রমশালী হইয়া সমাজকে লণ্ডভণ্ড করিতেছে, সমাজের মূলভিত্তি ভাঙ্গিয়া চূরমার করিতেছে, আবার সমুদ্রপারে যাইয়া দেশ বিদেশ জয় করিতেছে, সাম্রাজ্যস্থাপন, ব্যবসায়প্রচার করিতেছে, রণতরী সাজাইতেছে, আকাশতরী (air-ship) নির্ম্মাণ করিতেছে, রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে, মহাদেশে মহাদেশে যুদ্ধ বাধাইয়া দিতেছে।

নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতায় সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্যোগ

তবুও এই বিরোধ ও অশান্তির ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা

একটা সামঞ্জস্য বিধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। বিংশ-শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা সমন্বয় বিধান করিতে বদ্ধ-পরিকর,—ধর্ম্ম, নীতি আর্টের সহিত বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের দ্বন্দ্ব দূর করিবার জন্য প্রয়াসী। এ সমন্বয় বিধানের নেতা কাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া কঠিন। রাস্কিন, উইলিয়াম মরিশ, কার্লাইল, কার্লমার্ক্স সকলেই যুগান্তর আনিবার সহায়তা করিয়াছেন। আরও কত লোক কত মহাত্মা কত মহানুভব ব্যক্তি যুগান্তর আনিবার আয়োজন করিয়াছেন তাহার নাম করা যায় না। এখনও যে নবযুগ আসে নাই, পাশ্চাত্য সমাজের যুগধর্ম্মই এই যুগান্তর প্রবর্ত্তন। তাই আধুনিক সমাজের প্রত্যেক ভাবুক ও কর্ম্মবীর কোন না কোন উপায়ে নবযুগ আনয়নের সহায়তা করিতেছেন।

সমাজতন্ত্র-সমবায়

পাশ্চাত্য সমাজের আশা, সমাজতন্ত্রবাদ অর্থের নির্য্যাতন দূর করিবে, ধনশক্তি ও শ্রমশক্তির দ্বন্দ্ব নিবারণ করিবে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে অসাম্যের পরিবর্ত্তে সাম্য আনয়ন করিবে; সমবায়—দ্রব্যোৎপাদন দ্রব্যবিক্রয়ে সমবায়—সমাজ-শক্তি ও ব্যবসায় শক্তির দ্বন্দ্ব নিবারণ করিবে, ব্যবসায়কে সমাজের কল্যাণকর করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ব্যবসায় যাহাতে সমগ্র সমাজের উন্নতিবিধানে নিয়োজিত হয়, ব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিযোগিতা দমন ও সহযোগিতার উৎসাহের ফলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের যাহাতে সুবিধা হয়, সমবায় সেই বিধান করিবে।

উদ্যানপুরী নির্ম্মাণ

সব দিকেই একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হইতেছে—সমাজ গঠনে গ্রাম ও নগরের সামঞ্জস্য বিধান হইতেছে। শিল্প ও ব্যবসায়-কেন্দ্র নগরগুলি যাহাতে সমাজের সমস্ত ধন ও বুদ্ধিকে গ্রাস করিয়া পল্লীগ্রামের শক্তি শোষণ করিয়া স্ফীত কলেবরে সদর্পে সভ্যতার সর্ব্বেসর্ব্বা না হইয়া উঠে, সমগ্র সমাজেই যাহাতে দেশের শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার জন্য নগর ও পল্লীসংস্কারের (Civics) আয়োজন চলিতেছে। নগরে বিলাসিতা ও সৌখীনতার পার্শ্বে কঠোর দৈন্য দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা যাহাতে মাথা তুলিয়া না দাঁড়ায় তাহার জন্য উদ্যানপুরী (Garden city) নির্ম্মাণের ব্যবস্থা চলিতেছে। সহরনির্ম্মাণ কার্য্যে শ্রমজীবীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে।

গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের সামঞ্জস্য-স্থাপন

পোর্ট সনলাইটে একটা সুন্দর নূতন নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রমজীবীদিগের জন্য সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, নগরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে। বোর্ণভিল আর একটি সুন্দর ও নূতন গ্রাম—পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গ্রাম অনেকে বলিয়া থাকেন। উদ্যানপুরী সমিতি (Garden Cty Association) প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার এবেনেজার হাওয়ার্ড এইগ্রাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—Bournville is one of the most beautiful villages in

world, largely because of the potentialities of a new site acquired for the definite purpose of building thereon a village in wich overcrowding shall be deliberately and permanently prevented and in which work inside the factory may be relieved by work in the Garden. লোক সংখ্যার যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না হয় এবং সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য হানি না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে। লণ্ডন হইতে প্রায় কুড়ি ক্রোশ দূরে লেচওয়ার্থে যে উদ্যানপুরী স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ৩০,০০০ লোকের স্থান হইবে। সহরের মধ্যে উদ্যানবেষ্টিত আদর্শ কুটির স্থাপিত হইয়াছে, সহরের বাহিরে জমিতে কৃষিকার্য্য হইবে। পুরাতন নগরও সংস্কৃত হইতেছে। অধ্যাপক গেডিস এডিনবারা নগরকে একই সঙ্গে উদ্যানপুরী ও শিল্পকেন্দ্র করিয়া গঠন করিতে চাহেন—(an industrial city and a garden city in one) এবং তাঁহার জরিপে (Civic Survey) চরম ভাবুকতা ও কঠোর বাস্তবিকতার সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে,—নগরকে তিনি আর্ট ও কর্ম্ম, সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি করিয়া গড়িতে চাহেন—the Town as Place, as Work, as Folk,—the City of Etho-Polity, Culture and Art.

গেডীস-প্রতিষ্ঠিত নগর-বিজ্ঞান

আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী অ্যাণ্ড্রু কার্ণেগী তাঁহার স্বগ্রাম ডাম-

ফার্ম্মলিনের উন্নতির জন্য আধ মিলিয়ন পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক গেডীস সেই উপলক্ষে নগরের উন্নতি সাধন প্রণালী তাঁহার একখান সুন্দর রিপোর্টে আলোচনা করিয়াছিলেন।* নগর-বিজ্ঞানের (Civics) এর সেই প্রথম সৃষ্টি। উদ্যানপুরী নির্ম্মাণ গেডীস-প্রতিষ্ঠিত নগর বিজ্ঞানের অঙ্গমাত্র। পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞান-সভ্যতা বিভাগনীতি অবলম্বন করিয়া বিরোধ আনিয়াছে, পৃথক করিতে যাইয়া শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছে। বিরোধ ও পৃথককরণ নীতি ত্যাগ করিয়া এখন পাশ্চাত্য সভ্যতাসমন্বয় বিধান, সামঞ্জস্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর। সমাজ-তন্ত্রবাদ সমবায়-নীতির মত উদ্যান-পুরীনির্ম্মাণব্যবস্থাও পাশ্চাত্য সমাজের সমন্বয় বিধানের চেষ্টার একটা প্রধান লক্ষণ।

নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ

বিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতা কানাডার বন্দরে জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শস্যোত্তোলনের কল ভাঙ্গিয়া আরও প্রকাণ্ড কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য পাতালের নিভৃত প্রদেশে আলোক জ্বালিয়া কল পাঠাইয়া কুবেরের সঞ্চিত ধন কাড়িয়া লইয়াছে, চিকাগো সহর ভাঙ্গিয়া আবার দীর্ঘায়তন উদ্যানবেষ্টিত আদর্শ-কুটিরপূর্ণ

* P. Geddes. City Development. Park, Gardens and Culture Institutes : a Report to the Carnegie Dumfermline Trust. Edinburg.

নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে, পানামা খাল কাটিয়া মহাদেশের সহিত মহাদেশের ব্যবসায় সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিয়াছে,—শিল্পচাতুর্য্যের উৎকর্ষ সাধন দেখা গিয়াছে। শিল্প সভ্যতার প্রথম যুগ অতীত হইয়াছে, Paleo-technic সভ্যতা বিদায় লইতেছে, শিল্প-সভ্যতার নূতনযুগ আসিতেছে, neo-technic সভ্যতা নূতন ভাব ও আদর্শ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে,—রাস্কিন ও কার্লমার্ক্স নূতন বেশে আবার সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—নূতন শিল্প সভ্যতার লক্ষণ—বিরোধ নিবারণ, সামঞ্জস্য স্থাপন। নূতন সভ্যতার ভাব ও আদর্শ synthetic। শিল্পচাতুর্য্য এবার ভেদবুদ্ধির প্রভাবে সমাজ-বিরোধী হইবে না। শিল্পচাতুর্য্যের সহিত মহনীয় ভাবুকতার সম্মিলন হইবে। ধনীর অট্টালিকা ও শ্রমজীবীর ভাঙ্গা ঘর, ব্যবসায়ীর কারখানা ও শিল্পীর আর্টস্কুলের মধ্য দিয়া সমাজের শক্তি পৃথকভাবে সঞ্চারিত হইয়া যে পরস্পর বিরোধী হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান হইবে, দিন-মজুর ও ব্যবসায়ী, সাধারণ লোক ও উকীল ডাক্তারের পরস্পর বিরোধ-পূর্ণ নগর, ভূমিস্বত্বহীন কৃষক ও শিকারপ্রিয় বিলাসী জমিদারের বিরোধপূর্ণ হতশ্রী পল্লীগ্রাম সংস্কৃত পুনর্গঠিত হইবে। শিল্প-সভ্যতা শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবে না। গাল্টন ও পিয়ার্শন প্রভৃতি ডারুইন ও ভিসমানের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিল্প সভ্যতা প্রাণবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে আর্ট, ধর্ম্ম, নীতিকে অবলম্বন করিয়াই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে—সমগ্র জনসমাজের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি তাহার লক্ষণ হইবে—তাহার আদর্শ Eugenic, Eudemic.

প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুকরণ হেতু ভারতীয় সমাজে বিরোধ ও অশান্তি

পাশ্চাত্য শিল্প সভ্যতার দ্বিতীয় যুগের ভাব ও আদর্শ সম্বন্ধে যে এত কথা বলিলাম তাহা কি অবান্তর হইল ? তাহা নহে। যদি কাহারও তাহা মনে হয় তবে আমার আলোচনা ও আলোচনার বিষয়ের জটিলতা তাহার জন্য দায়ী। যদি স্পষ্ট ও খুব সোজাভাবে কথাটা বলিতে হয়, তবে তাহা এই—ভারতবর্ষ যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এক্ষণে অনুকরণ করিতেছে তাহা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজের অতীত ও হৃতগৌরব paleo-technic শিল্প-সভ্যতা। আমরা বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষায় অন্ততঃ একশত বৎসর পশ্চাতে রহিয়াছে। আধুনিক neo-technic পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতার ভাব ও আদর্শ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—তাই আমরা বিরোধমূলক paleo-technic সভ্যতাকে অনুকরণ করিয়া নাগরিক জীবনকে চরম লক্ষ্য মনে করিয়াছি, নগরে আসিয়া কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া ধনশক্তি ও শ্রমশক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতেছি, শিল্পোন্নতিকে লক্ষ্য না করিয়া চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়াছি, জনসাধারণ ও উকিল ডাক্তার ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছি, দৈন্য ও দারিদ্র্যের পার্শ্বে বিলাসিতা ও সৌখীনতাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি, নগরে এক আর্টনীতি ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত শিল্প-ব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছি—পল্লীজনপদের সমস্ত ধন ও বুদ্ধি শোষণ

করিয়া, পল্লী গ্রামের বৈষয়িক জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তি কৃষকের ভূমিস্বত্বের লোপসাধন করিয়া এবং তাহার মানসিক ভিত্তি যৌথ পরিবারের সম্বন্ধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া। পাশ্চাত্য-শিল্প-সভ্যতায় আধুনিক যুগে যে উদ্যানপুরী নির্ম্মাণ, পল্লীসংস্কার, নগর সংগঠন, নগরকে গ্রামের সৌন্দর্য্য শ্রীতে মণ্ডিত করিবার আয়োজন চলিয়াছে তাহার খোজ আমরা রাখি না। আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজ নগর ও পল্লী গ্রামের বিরোধ দূর করিবার জন্য যে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, আধুনিক neo-technic সভ্যতার পক্ষে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা যে খুব বড় সমস্যা তাহার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, আমরা অন্ধ হইয়া পাশ্চাত্য শিল্প সভ্যতার প্রথম যুগের অশান্তি ও বিরোধ আমাদের সমাজে আনয়ন করিতেছি। তাই বলিয়াছি আমরা ইউরোপীয় সভ্যতাকে অনুকরণ করিতেছি না, ইউরোপীয় সভ্যতার জীর্ণ পুরাতন সংস্করণের দুই চারিটা পাতা আমরা ছিঁড়িয়া আনিয়াছি, তাহার বুলী আওড়াইয়া মনে করিতেছি আমরা সভ্য, উন্নত, বিজ্ঞান ব্যবসায়ে পারদর্শী হইলাম; এরূপে আমাদের দৈন্য ও অপমানের ত সীমা নাই, আমরা ইউরোপীয় সভ্যতাকেও অপমান করিতেছি।

সভ্যতার প্রবাহে পল্লী ও নগরের স্থান নির্ণয়

ক্ষুদ্র একটী নির্ঝর বৃষ্টির জলে প্রাণ পাইয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছে, আরও অনেক নির্ঝর আসিয়া তাহার সঙ্গে মিশিল; পর্ব্বতের সানুদেশে একটা স্রোতের মত দেখা গেল। স্রোত নদীতে পরিণত হইল। নদী চলিতে লাগিল, কত বন, উপবন, কত বনে

ঘেরা গরু চরাইবার মাঠ, কত শ্যামলক্ষেত্র, কৃষকের কত ছোট ছোট কুটির কত হাট বাজার অতিক্রম করিয়া নদী চলিতে লাগিল, লোকবহুল সহর আসিল, সহরের কল কারখানা, চিমনির ধূম, আফিস আদালত পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, নদী তবুও চলিতে লাগিল, আরও নদ নদী আসিয়া তাহার সঙ্গী হইল। বন্দর ছাড়িয়া নদী শেষে সমুদ্রে পৌছিল। ঠিক এই প্রকারে সবকালে সব দেশে মানুষও কি নির্ঝরের সঙ্গে, সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে না? বন্য পশুর আবাসভূমি পার্ব্বত্যপ্রদেশে—যেখানে মানুষ শিকারী হইয়া অতিকষ্টে আপনার জীবনরক্ষা করে—তাহার নিম্নে পর্ব্বতের সানুদেশে, গরু চরাইবার মাঠে, কিছু দূরে দুই একটা বনে ঘেরা কুটির—আরও নিম্নে পার্ব্বত্য দেশের একটা ছোটখাট গ্রাম ও বাজার, যতই আমরা নির্ঝরের সহিত নিম্নে নামিতেছি ততই মানুষ সংখ্যায় ও সভ্যতায় উন্নতির পথে চলিয়াছে। আরও নিম্নে আসিয়া একটা বড় গ্রামে পৌছিলাম,—যে সমতল ভূমির উপর দিয়া নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, তাহার মাঝখানে গ্রামটি অবস্থিত—কৃষিশিল্প ব্যবসায়ের দ্বারা মানুষ সেখানে সহজে জীবন ধারণ করিতেছে, সেখানে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন হইতেছে—কত রাস্তা রেললাইনও সেখানে আসিয়া মিশিয়াছে এবং মিশিয়া শিল্প বাণিজ্য সভ্যতার পুষ্টিবিধান করিতেছে। সেখান হইতে একদিনের পথ যাইলে নগর—অনেকগুলি নদীর দ্বারা সেবিত, সমতল ভূমিসমূহের কেন্দ্র নগর, শিল্প, বাণিজ্য ও সভ্যতার পরিপোষক। আরও দূরে নদী সমুদ্রে পৌছিবার পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড বাণিজ্য-কেন্দ্রের

কারখানার গোলমাল ও চিমনীর ধূমে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। দেশের উদ্বৃত্ত ধনসামগ্রী সেখান হইতে বাহিরের জগতে রপ্তানি হয়। সভ্যতার আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা যদি পল্লীগ্রাম লইয়া আরম্ভ করি, বন-উপবন সানুদেশের কথা ভুলিয়া যাই, যদি আমরা শিকারী মানুষকে একবারে ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আমরা সমাজের আভ্যন্তরীণ রক্ষা ও পালনশক্তির বীজ খুঁজিয়া পাইব না, মণ্ডল পঞ্চায়তের উৎপত্তি কোথায় জানিব না, সমাজ-তন্ত্রের ঐতিহাসিক শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। সভ্যতার আলোচনায় নগরকে কেন্দ্র করিলে, পল্লীগ্রামকে ভুলিয়া গেলে, আমরা যাবতীয় মহনীয় ভাবের উৎসকে অগ্রাহ্য করিব, শুধু ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র নহে, সুকুমার সাহিত্য, দর্শন, কলা, শিক্ষা দীক্ষার উৎস সকল প্রকার ভাবুকতাকেই অগ্রাহ্য করিব। পর্ব্বত, পর্ব্বতের সানুদেশ, সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র, ও বিশালনগর সকলই সভ্যতাকে তাহার আপনার দান দিয়াছে ও এখনও দিতেছে। যে নদী বিশাল নগরের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া বন্দরের দিকে যায় সেই নদীই ত পর্ব্বত, পর্ব্বতের সানুদেশ ও নিম্নের শ্যামল শস্যক্ষেত্রের স্মৃতি বক্ষে করিয়া আসিয়াছে।

জাতীয় সভ্যতা গঙ্গার পুণ্যপ্রবাহ

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশাল নগরের সমৃদ্ধি দর্শনে স্ফীত হইয়া দম্ভ করিয়া এত দিন সেই সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র পর্ব্বত পল্লীগ্রামকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল। সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, ভুল সংশোধন

করিতেছে। আমাদের জাতীয় সভ্যতা-গঙ্গা পুণ্যতীর্থ গঙ্গোত্রি যমুনোত্রি অতিক্রম করিয়া কত বন উপবন শ্যামল প্রান্তর শস্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্রে মিশিবার জন্য ছুটিয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সভ্যতা গঙ্গার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গতিরোধ করিয়াছে, জাতীয় সভ্যতার পুণ্য সলিলকে খাল কাটিয়া নানা প্রবাহে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে,—তাই আমাদের সভ্যতা গঙ্গা, আমাদের সেই হরিদ্বার প্রয়াগ কাশীতলবাহিনী চির কলতান নাদিনা গঙ্গা, বিশীর্ণদেহা, ক্ষীণকণ্ঠা হইয়াছে। আজ এই শ্রাবণের ঘন বরষায় যখন গঙ্গার সেই ক্ষীণকায় অস্থিপঞ্জরসৈকতসার দেহ আর দেখিতেছি না, যখন সেই পূতকলতানমুখরা পূর্ণাবয়বা আবার আমাদের কর্ণে তাহার সেই পতিতোদ্ধারণ জলকল্লোল উচ্চারণ করিতেছে, আমাদের মোহান্ধ নয়নে তাহার সেই স্নিগ্ধ শীতল তরঙ্গধারা লেপন করিতেছে, আমাদের এই মোহ-পাপ-কলুষিত দেহের উপর তাহার মোক্ষদসলিলবিন্দু বর্ষণ করিতেছে,—তখন মনে হইতেছে আমাদের অনুকরণের মোহ দূর হইবে, আমরা অনুকরণের মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার সতেজ, সবল হইব, আর আমাদের জাতীয় সভ্যতা নানা সেতুর নানা বিঘ্ন নানা প্রবাহের নানা বিক্ষেপ অতিক্রম করিয়া সেই মহাসাগরে আমা-দিগকে পৌছাইয়া দিবে সাগরসঙ্গমের সেই মহাতীর্থে, যেখানে শুধু কলিকাতা মহানগরীর জোয়ারের জল নহে, গঙ্গাতীরের অসংখ্য পল্লীগ্রামের তীর্থের জল আসিয়া মিশিবে—কলিকাতার মত শত নগরের কারখানার তেল ও ময়লা সে জলকে মলিন করিতে

পারিবে না, নবদ্বীপের মত শত পল্লীগ্রামের শঙ্খমুখরিত দেবমন্দিরের ছায়া সে জলে ভাসিয়া উঠিবে আর তীর্থযাত্রীকে সেই মন্দিরের দেবতার দিকে আহ্বান করিবে।

পরিশিষ্ট।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও বৈষয়িক সমস্যা

একটা শিকলকে আমরা খুব শক্ত মনে করিতেছি। শিকলটাকে কেহ খুব জোরে টানিল, সেটা ছিঁড়িয়া গেল। শিকলের জোর জোর বুঝিতে গেলে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল কড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। শিকলের জোরের মত আমাদের শিল্পবাণিজ্য প্রণালীর শক্তি এই যুদ্ধের দুর্দ্দিনে বেশ বুঝা গিয়াছে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের দুর্ব্বলতা এখন ঠিক ধরা পড়িয়াছে।

বিদেশে রপ্তানি বনাম দেশীয় বাণিজ্য

আমরা বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি, আমাদের কৃষিকর্ম্মের উপর ইউরোপীয় বণিকগণ ধীরে ধীরে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে. আমরা যে খাদ্য শস্য অধিক উৎপন্ন না করিয়া পাট তুলা তিসি ইত্যাদি উপকরণ শস্য উৎপন্ন করিতেছি, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া আমরা যে ক্রমশঃ বিদেশীয় বাণিজ্যকে আমাদের সম্বল মনে করিতেছি ইহাতে দেশের সকলের বিশেষতঃ কৃষক শ্রমজীবিগণের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলের সূচনা হইতেছে সন্দেহ নাই।

১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে চাউল গম ইত্যাদি খাদ্য শস্য

চাষের পরিমাণ শতকরা কেবলমাত্র ৭.১৭ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু তুলা পাট ইত্যাদি উপকরণ-শস্যের পরিমাণ এই কয় বৎসরে ৫০.০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমরা আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাভাব জন্য যে বিদেশীয়দিগের উপর নির্ভর করিতেছি শুধু তাহা নহে ; আমাদের কৃষি. দেশীয় অভাবমোচনের জন্য অধিক তৎপর না হইয়া আপনার উন্নতির জন্য বিদেশীদিগের অভাব মোচনে ব্যস্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদের বিদেশীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করিয়া আমাদের অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া দিল। আমরা না বুঝিয়া একটা ভুল বাণিজ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলাম। এখনকার অন্নকষ্ট আমাদের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

পাটের উদাহরণ হইতে শিক্ষা লাভ

আমাদের কৃষকগণ পাট চাষ করিয়া বিদেশে পাট রপ্তানি করিয়া কিছু অর্থলাভ করিতে পারিয়াছিল। এখন পাট উৎপন্ন করিয়া কৃষকগণ তাহা বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। মাঠের পাট মাঠে পচিতেছে, কৃষকগণের হা হুতাশ সত্ত্বেও ব্যাপারীরা পাট ক্রয় করিতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গে পাটই কৃষকের প্রধান সম্বল। পাট বিক্রয় না হওয়াতে সেখানে অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে পাট বিক্রয় যে কত কমিয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকাটি পড়িলে বুঝা যাইবে।

জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ১৯১৩ ঐ কয় মাস ১৯১৪

নারায়ণগঞ্জ	৩১, ৯০, ৩৫৪ মণ	৬৮, ৪০০ মণ।
চাঁদপুর	১১, ৯৯, ৯০১ মণ	৬, ৯৭, ২১০

সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জ হইতেও পূর্ব্ব বৎসরের এক তৃতীয়াংশ মাত্র পাট রপ্তানি হইয়াছে।

পাট উৎপন্ন করিয়া ঘরে অর্থ আসিল না। পাটে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং অনেক কৃষক অর্দ্ধাশনে অনাহারে রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের দুরবস্থা ও পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকের অন্নকষ্টের কথা স্মরণ করিতে আমরা এই কয়টি বৈষয়িক তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি।

১। কোন দেশেরই পক্ষে খাদ্য শস্যচাষ হ্রাস করিয়া উপকরণ শস্য চাষের উৎসাহ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

২। অর্থলাভ বৈষয়িক ক্ষেত্রেও সার্থক নহে যখন অর্থের বিনিময়ে খাদ্য পাওয়া সুকঠিন।

৩। উপকরণ শস্য চাষ সেই ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, যখন উহা হইতে দেশেরই কলকারখানার দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

৪। পূর্ব্বলিখিত ব্যবস্থায় উপকরণ শস্য চাষ সুবিধাজনক হইলেও খাদ্য শস্যের পরিবর্ত্তে উপকরণ শস্য উৎপন্ন করা মঙ্গলজনক নহে।

উপায় কি ?

এখন উপায় কি? উপায় হইতেছে পাট চাষের পরিবর্ত্তে ধান্যচাষ পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তন করা। ইতিমধ্যে অন্নকষ্ট সহ্য করিতে

হইবে। এক উপায় ছিল—অন্য দেশে যুদ্ধের সময়ে এরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে—গভর্ণমেণ্ট, যে পাট বিক্রয় হয় নাই তাহা ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু আধুনিক ক্ষেত্রে তাহাও সম্ভব নহে। তবে যতদিন না ধান্য আবশ্যকমত প্রচুর পরিমাণে না উৎপন্ন হয় ততদিন অন্নকষ্টকেই বরণ করিতে হইবে।

এই অন্নকষ্ট হইতে যদি আমাদের উপকর-শস্য চাষের কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, যদি দেশের কৃষকদিগের এ সম্বন্ধে চোখ ফুটে, তবে বর্ষব্যাপী কলেরা বসন্ত অপেক্ষা এই অন্নকষ্টই বাঞ্ছনীয়।

বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় আমরা আমাদের বর্ত্তমান কৃষির দুর্ব্বলতা বুঝিলাম। শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রেও আমাদের অক্ষমতা এই যুদ্ধ হেতু প্রতীয়মান হইয়াছে।

স্বদেশী ও সংরক্ষণ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে দ্রব্যের আমদানী ও আমাদের দেশ হইতে ঐ দুই দেশে রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডের সহিত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোন অংশের সহিত শত্রুপক্ষের বাণিজ্য চলিতেছে না। ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সভা জার্ম্মাণী এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় ঔষধ, রাসায়নিক উপকরণ রং, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল, সে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে কি না তাহা চিন্তা করিতেছে।

আমাদের দেশেও স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়া জার্ম্মাণবাণিজ্য হস্তগত করিবার একটা আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশী

আন্দোলন, শিল্প-সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা আবার দেখা দিয়াছে। এবার ইংরাজ পত্রিকা স্বদেশী লইয়া কোন বিবাদ করে নাই। ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, দেশে এতদিন অবাধ-বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত ছিল; সেই জন্য বৈদেশিকপণ্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এক্ষণে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে যে সকল দ্রব্যের আমদানী হয়, সে সকল দ্রব্য দেশবাসীরই পক্ষে প্রস্তুত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঠিক নয় বৎসর পূর্ব্বে এ কথা ইংলিসম্যান বলিলে দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। যাহা হউক সত্য কথা বলিলে দোষ নাই, মিথ্যা বলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিলম্বে হইলেও ভাল।

জার্ম্মাণীর বাণিজ্য

জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে আমরা যে সকল দ্রব্যের অধিক আমদানী করিয়া থাকি, তাহাদের তালিকা অনুধাবন করিলে আমাদের কোন্ কোন্ শিল্পের উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য তাহা বুঝা যাইবে।

		জার্ম্মাণী	অষ্ট্রীয়া
১।	পোষাক পরিচ্ছদ	১৬,৬০,৪১৩৲	৮,২৩,৭৩৮৲
২।	রং	৮১,১২,২০৫৲	
৩।	কাচ, চুড়ী ইত্যাদি	২৮,৫৮,৬৪১৲	৮৭,৩৮,৭২৮৲
৪।	পশমী কাপড়	৩৯,৮৭,৬৪১৲	
৫।	পশমী শাল	৪৪,৩২,২১০৲	২,০৬,৮৩৫৲

৬।	চিনি	১,২৪,৩১১৲	১,৩৭,৭৬,০৯০৲
৭।	লোহার কল, কড়ি ইত্যাদি	৬৪,০৮,২৯৪৲	৭২,৭০,২২২৲
৮।	কাগজ	৩,৭৬,৮৭১৲	৫,৬৬,০৯৫৲

তালিকায় সকল দ্রব্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু উহা হইতে আমরা মোটামুটি আমাদের বৈষয়িক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি।

পোষাক পরিচ্ছদ

পোষাক পরিচ্ছদ, সার্ট, গেঞ্জী প্রভৃতি বোম্বাইয়ের কলে তৈয়ারী হইতে পারে; কিন্তু যতদিন না ব্যবসায়ীরা তাহাদের শিল্পপ্রণালীতে পুরাতন পথ না ছাড়িয়া দেয়, ততদিন ইহা অসম্ভব। তাহা ছাড়া বোম্বায়ের ব্যবসায়ীদিগের এখন দুঃসময়। চীনে অনেক কাপড় বিক্রয় হয়, কিন্তু জাহাজ অভাবে চীনের সহিত বাণিজ্য লোপ পাইয়াছে। অনেক সূতা ও কাপড় তৈয়ারী রহিয়াছে, মাল বিক্রয় হইতেছে না। কাজেই অনেক মিলে এখন কাজ বন্ধ রহিয়াছে। Jacob Sassoon, China, Moon প্রভৃতি কল একবারেই বন্ধ; অন্য সকল মিলে খুব কম কাজ হইতেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সার্ট, গেঞ্জী প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগের স্থান অধিকার করা বড় সহজ নহে।

স্বদেশী রং

আমাদের দেশে গাছ গাছড়া হইতে রং তৈয়ারী হইত।

জার্ম্মাণী আলকাতরা হইতে অতি সস্তায় সুন্দর রং তৈয়ারী করিয়া পৃথিবীময় বিক্রয় করিতেছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যাহারা রং তৈয়ারী করিত, তাহারা এখন অন্য শিল্পে মনোযোগ দিয়াছে, কাজেই পুনরায় দেশে রং দেশীয় প্রণালীতে তৈয়ারী করা বড় সহজ নহে। তবুও অনেকে মনে করিতেছেন, নীল হইতে রং তৈয়ারী করা এখন সম্ভবপর, কিছু উন্নতির সম্ভাবনাও আছে। এমন কি বেহারে কয়েক জায়গায় নীলকুঠিও স্থাপিত হইয়াছে। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রঙ্গ বিবেচনা করিয়াছেন, যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে জার্ম্মাণ রংয়ের সহিত দেশীয় নীল প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতে পারে।

কাচের ব্যবসায়

১১৬ লক্ষ টাকার কাচ চুড়ি ইত্যাদি আমরা জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে আনিয়া থাকি। আমাদের দেশে কুটিরে শিল্পীরা কাচের চুড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে—বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক্ষেত্রে কুটির শিল্পের কত দূর উন্নতি সাধনা করা যাইতে পারে তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। বেলজিয়াম্ ও জাপানে কুটির শিল্প-প্রণালীর দ্বারাই সুন্দর সুন্দর কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে—আমাদের দেশে তাহা করিবার চেষ্টা করিলে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। পঞ্জাবে কয়েকটা কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা এই সুযোগে খুব উন্নতি লাভ করিবে নিশ্চিত।

কুটিরে কাচ তৈয়ারী

পঞ্জাবে যাহারা কুটিরেই কাচের চুড়ী ইত্যাদি তৈয়ার করে, তাহারাই কাচের কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছে। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে যে সকল Blowerদিগকে পূর্ব্বে আনা হইয়াছিল, তাহাদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত বেশী, এমন কি ২০০৲ হইতে ৩০০৲ পর্য্যন্ত। এদিকে দেশীয় শিল্পিগণ কারখানায় প্রবেশ করিয়া অতিসুন্দর কাজ করিতে শিখিয়াছে, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া ইউরোপীয় শিল্পীদিগের মতই পারিশ্রমিক আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত এবং কাচের কায তাহাদের একচেটিয়া হওয়াতে তাহারা বেশী পারিশ্রমিক লইয়া কারখানার পরিচালকদিগকে ঠকাইবার জন্যও সচেষ্ট। উপযোগী কাচ পঞ্জাবে খুব সস্তায় মিলে, পঞ্জাবের আবহাওয়া কাচ তৈয়ারীর উপযোগী; অনেক মূলধন কাচের কারখানায় নিয়োজিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তবুও কিছু হইতেছে না। যাহারা কুটিরে বসিয়া দেশীয় প্রণালীতে কাচভাঙ্গা শিশি, চিমনি গলাইয়া কাচের চুড়ী তৈয়ারী করে তাহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিখাইবার ব্যবস্থা করিলে কাচের কারখানা কয়জন নিপুন শিল্পীর একচেটিয়া হয় না। কে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, আমরা না গভর্ণমেণ্ট? শিক্ষার এরূপ একটা ব্যবস্থা করিলে এই সুযোগে কারখানাগুলা কি দাঁড়াইয়া যাইতে পারিত না?

চিনির ব্যবসায়ের অবনতির ইতিহাস

তাহার পর চিনি তৈয়ারীর কথা। আমাদের দেশ হইতেই

কিছুকাল পূর্ব্বে দেশ বিদেশে চিনি রপ্তানি হইত। পাশ্চাত্যজগৎ ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বাধিক পরিমাণে চিনি আমদানী করিত। আর এখন আমরা যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে চিনি পাইব না বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছি!

নেপোলিয়নের মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের ব্যবসায় ধ্বংস করিবার জন্য নেপোলিয়ন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের প্রস্তুত অথবা ইংলণ্ড কর্ত্তৃক আনীত কোন দ্রব্য ইউরোপের লোক ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইউরোপ তখন ইংলণ্ড হইতে অনেক পরিমাণে চিনি আমদানী করিত। যুদ্ধের সময় সে আমদানী বন্ধ হওয়াতে, ফ্রান্স জার্ম্মাণী প্রভৃতি মহাবিপদে পড়িল। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের একজন বিজ্ঞানাধ্যাপক বিট হইতে চিনি তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮০১ সাল পর্য্যন্ত বিট চিনির কারখানা তৈয়ারী হয় নাই। প্রথমে ফ্রান্সেই অধিক পরিমাণে বিট চিনি তৈয়ারী হইতে লাগিল, তাহার পর জার্ম্মাণী গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইয়া চিনির ব্যবসায়ে লাগিল। অন্য দেশে জার্ম্মাণ ব্যবসায়িগণ যাহাতে চিনি বিক্রয় করিতে পারে, তাহার সুবিধাবিধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিলেন। এরূপে জার্ম্মাণী বিট চিনির ব্যবসায়ে প্রাধান্য লাভ করিল।

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে বিট চিনি এবং যবদ্বীপ ও মরিষাস হইতে আকের চিনি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতে লাগিল। আমাদের দেশীয় চিনির ব্যবসায় বিনষ্ট প্রায় হইল।

আমাদের দেশে এখন চিনি আমদানী বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া চিনির কারখানার দিকে গভর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের নজর পড়িয়াছে। দেশীয় প্রণালীতে চিনি তৈয়ারীর অনেক বিষয়ে উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে। খাঁ বাহাদুর মহম্মদ হাদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেশীয় প্রণালীর উন্নতিসাধন করিয়া দেশবাসীর বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বাংলাদেশে হাদির উন্নত প্রণালী ব্যবহৃত হইলে এই শিল্পে বিশেষ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশে চিনি তৈয়ারী

চিনির কারখানা অধিকাংশই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে। বাংলা-দেশে একটানা বিস্তৃত আখের ক্ষেত নাই; সুতরাং চিনির কারখানা স্থাপনের এখানে সুবিধা কম। আখ গুদামে সঞ্চিত করিলে নষ্ট হইবে, কারখানায় এত অধিক আখ প্রত্যেক দিনেই প্রয়োজনীয় যে খুব বিস্তৃত আখের ক্ষেতের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করিলে কারখানা চলিবে না। তাহা ছাড়া যবদ্বীপের চিনি প্রথমে জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসে, তাহার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সঞ্চালিত হয়।' বাংলা দেশের চিনির কারখানা "সংরক্ষিত" না হইলে তাহার পক্ষে যবদ্বীপের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব।

লোহার কল, কড়ি ও কাগজ তৈয়ারী

লোহার কল, কড়ি ইত্যাদি আমাদের সাকচির বিপুল কার-

খানায় তৈয়ারী হইতেছে। জার্ম্মাণ হইতে এ সকল দ্রব্যের আমদানী কমিলে ভারতীয় কারখানা উন্নতি লাভ করিবে সুনিশ্চিত।

দেশে অনেকগুলি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কয়টি গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্ট লাভ করিয়াছে তাহাদের অবস্থা মন্দ নয়, বাকীগুলি অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণীর কাগজের সহিত প্রতিযোগিতায় কোন রকমে বাঁচিয়া আছে।

যে সকল দ্রব্য আমরা জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া হইতে আমদানী করিয়া থাকি, সে সকল দ্রব্যের দেশীয় কারখানায় তৈয়ারীর ব্যবস্থা এবং অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

বাণিজ্যে জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব ও আমাদের শিক্ষা

অন্য দেশ অপেক্ষা জার্ম্মাণী এই সকল দ্রব্য বিষয়ে ব্যবসায়ে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। আমরা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারিব।

আমদানী দ্রব্য বিষয়ে জার্ম্মাণীর ব্যবসার অংশ।

	শতকরা
তৈয়ারী নীল	৮৮-৭
অন্য প্রকার তৈয়ারী রং	৭৯ ৭
আলুমিনিয়াম	৪৮-২
ষ্টীল	৩৬-৪
তামা	৩৫ ৫

ছুরি কাঁচি ইত্যাদি	৪৩.৪
পশম	২৭.৯
খেলনা	২৬.২
মদ	২৪.১
কাগজ	১৭.৩
কাচ	১৪.৭
রাসায়নিক দ্রব্য	১২.৪

যুদ্ধের পূর্ব্বেই জার্ম্মাণী এই সকল শিল্প ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে ব্রতী হইবে। জার্ম্মাণী উন্নতবৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া, শিল্প ও বাণিজ্যকে সংরক্ষণ করিয়া আপনার বিরাট-শিল্প ও ব্যবসার অনুষ্ঠান গঠন করিয়াছে। আমাদের প্রতিযোগী প্রবলপরাক্রমশালী। প্রতিযোগিতায় সফল হইতে হইলে, আমাদিগের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে এবং যুদ্ধ যে কয় মাস চলিতেছে, সেই সময়ের মধ্যেই ব্যবসায় জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এক একটা বড় যুদ্ধের সময়ে শুধু রাজ্যের ভাঙ্গা গড়া হয় না, ব্যবসায় জগৎও তোলপাড় হয়, ব্যবসায়েরও ভাঙ্গা গড়া হয়। এই যুদ্ধের সময়ে আমরা আমাদের নষ্টশিল্পের জীবনদান অথবা ম্রিয়মান শিল্পের জীবনরক্ষার একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ লাভ করিয়াছি। এ সময়েও যদি আমাদের ধন বুদ্ধি কার্য্যকুশলতা সমস্ত শক্তি আমাদের কাযে না আসে, যদি এই সুযোগলাভ সত্ত্বেও আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তবে আমরা যে তিমিরে আজ আছি সে তিমিরে কাল রহিব, চিরকালই রহিব।

মথি অঙ্গহরে পর স্বর্গসুখে
তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে।

জার্ম্মাণীর প্রতিযোগী হইতে হইলে, জার্ম্মাণীর হাতিয়ার হাতে লইতে হইবে, জার্ম্মাণী কি উপায়ে তাহার শিল্প ও বাণিজ্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে তাহা জার্ম্মাণীর শিল্প ও ব্যবসায় প্রণালী আমরা এদেশে নিয়োগ করিতে পারিব কিনা আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে।

জার্ম্মাণীর সংরক্ষণ নীতি

আধুনিক কালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা অপেক্ষা জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া ভারতীয় বাণিজ্যে অধিক উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯০৯-১০ সালের বাণিজ্যের সহিত এই বৎসরের বাণিজ্য তুলনা করিলে আমরা ইহা দেখিতে পাইব।

১৯১০-১৯১৪ এই পাঁচ বৎসরে ব্যবসায়ের উন্নতি, শতকরা হিসাবে—

	আমদানী	রপ্তানি	মোট
জার্ম্মাণী	৯৬.১	৪৬.৪	৫৯.৫ *
অষ্ট্রিয়া	৬৬.৯	৫৩.৮	৫৭.৫
ইংলণ্ড	৬০.৩	১৮.৭	৪৩.৬

* অর্থাৎ যদি পূর্ব্বে ব্যবসায় হইয়াছিল ১০০্র এখন ব্যবসায় হইতেছে ১৫৯,৫্ টাকার।

ফ্রান্স	১১৬.২	১৯.০	৩৪.৮
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৩০.২	৫০.৫	৪৬.৪

সাধারণ বাণিজ্যে বিশেষতঃ ভারতীয় বাণিজ্যে জার্ম্মাণীর এই অসাধারণ উন্নতির কারণ কি? জার্ম্মাণীর বাণিজ্যের সহিতও আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, জার্ম্মাণীর বাণিজ্য-শক্তি দমন করিতে গেলে জার্ম্মাণীর বাণিজ্য-উন্নতিসাধন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। জার্ম্মাণী বাণিজ্যে বড় হইয়াছে, জার্ম্মাণী পৃথিবীর বাণিজ্য আপনার করতলগত করিতেছে,—একমাত্র উপায়ে। সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া। যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা শিল্পের উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহা সংরক্ষণ করিয়া, যে শিল্প-শিক্ষার দ্বারা শ্রমজীবিদিগের শিল্প নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা সংরক্ষণ করিয়া, রেলপথ জলপথ যাহাদের দ্বারা শিল্প প্রসারিত হইতে পারে তাহা সংরক্ষণ করিয়া, বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশী শিল্পকে রক্ষা করিয়া। শুধু শিল্প-সংরক্ষণ নহে, বাণিজ্যে ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া। একটা ক্ষুদ্র শিশুশিল্প যাহাতে শৈশবোপযোগী আহার লাভ করিয়া সবল হইতে পারে, সবল হইয়া নিজ দেশে অবাধ স্বচ্ছন্দ বিহারের দ্বারা যাহাতে পুষ্ট হইতে পারে, রাষ্ট্র তাহার সুযোগ বিধান করিয়াছে; তাহার পর বিশ্ব-বাণিজ্যের মহামেলায় ক্ষুদ্র শিশুকে স্কন্ধে লইয়া রাষ্ট্র তাহাকে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি হইতেও রক্ষা করিয়াছে। তাই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর ক্ষুদ্র শিশু-শিল্প ও শিশু-বাণিজ্য আজ কলোসাসের আকৃতি ও শক্তি লাভ করিয়াছে, তাই তাহার

পদভরে জলস্থল কম্পিত, তাহার দম্ভ ও মত্ততায় জগৎ নির্ব্বাক-নিষ্পন্দ।

আজ এই কলোসাসের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে নামিয়াছি। কিন্তু এই কলোসাসকে কে শক্তি প্রদান করিল? যে কলোসাস আজ ব্যবসায়-লব্ধ অর্থে প্রতাপান্বিত হইয়া বাণিজ্য পথে মাথা তুলিয়া উদ্ধতভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহাই ত নীটশের 'অতি মানুষ' সাজিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপশালী। এই কলোসাস বা অতি-মানুষকে আমরাই শক্তি দান করিয়াছি। প্রবল শত্রুকে আমরাই হাতিয়ার প্রদান করিয়াছি।

অবাধ বাণিজ্য ও জার্ম্মাণ পোষণ

আমাদের অবাধ-বাণিজ্য-নীতি জার্ম্মাণীর শিল্প-ব্যবসায়ের পুষ্টি-বিধান করিয়াছে, আমরাই কলোসাসের শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করিয়াছি।

অবাধ বাণিজ্য-নীতির দ্বারা ইংলণ্ডের উপকার হইয়াছে সত্য; কিন্তু নিজ উপকার সাধন করিতে যাইয়া ইংলণ্ড যে তাহার শত্রুর শক্তি সঞ্চয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে তাহা এতদিন পরে সে বুঝিতেছে। আমরা ভারতবাসী ত কতকাল ধরিয়া ব্যবসায়ে শিল্পসংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনকে আমাদের শিশুশিল্পের উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায় স্থির করিয়া বসিয়াছিলাম। আজ এতদিন পরে—এই যুদ্ধের দুর্দ্দিনে—ইংলণ্ড বুঝিতেছে, জার্ম্মাণীর শিল্প ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা হইতে আমাদের শিল্পকে সে রক্ষা না করিয়া আপ-

নার শক্তিকে সে হ্রাস ত করিয়াছেই, শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির উপায় বিধানও করিয়াছে।

বর্ত্তমান শিল্পসংরক্ষণ চেষ্টা।

তাই আজ দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমাদিগকে আর কিছু বলিতে হইবে না। এসম্বন্ধে আমরা অনেক বলিয়াছি, এখন ইংরেজেরাই বলুক,—

Trade-opportunities in India in the pre-war period were as free to Germany as to Britain and rest of the world. On that trade the financial power which organised the means of aggression was largely built. Are we to continue these contributions to the German war-chest to aid them in the organisation of future orgies of violence ?

জার্ম্মাণীকে ভারতে শিল্পব্যবসায়ের সুবিধা প্রদান করিয়া আমরা তাহার যুদ্ধ সিন্ধুক আর ভারী করিতে যাইব না এই সমস্ত কথা ইংরাজ সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে।

অবাধ বাণিজ্যনীতি জগতে একা ইংলণ্ডই অবলম্বন করিয়াছে ; সব জাতিই ব্যবসায়ে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়া শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিয়াছে। একা ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্যনীতি অবলম্বনের কারণ,—ইংলণ্ড শিল্প ও ব্যবসায়ে ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইং-

লণ্ডের পক্ষে অবাধ বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা ছিল। কিন্তু সকল দেশই ক্রমে ক্রমে আপনাদের স্বার্থ বুঝিয়া বিদেশী দ্রব্যের অবাধ আমদানীর প্রতিরোধ করিয়াছে।

নবীন জাপান অবাধ বাণিজ্যনীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। জাপানের আধুনিক শিল্পোন্নতির কারণ শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন। এমন কি ইংলণ্ডের উপনিবেশ সমূহ ইংলণ্ডের কারখানার তৈয়ারী দ্রব্যের অবাধ আমদানী প্রতিরোধ করিয়াছে।

The free trade fetish may be dofined as the production of supplies in those areas best suited to such production, that is where most ecouomically produced, with freedom of exchange. The last condition has, however, been practically absent. The opportunities of tesing the pay-basis of this proposition have been before the Governments of world for many decades, and, with an exception only--that of the United Kingdom—they have unanimously rejected it. India, of course is merely an appanage of the United Kingdom in matters of policy, but the self governing colonies have unanimously rejected it. Japan, wich has tested occidental theories with oriental acumen,

refuses it absolutely and the economical situation in India is not very greatly different from that of Japan, before the renaissance of industry laid the foundations of the phenomenal use of the Island Empire in the Council of the Nations.

সকল দেশই শিল্পকে সংরক্ষণ করিয়া শিল্পের উন্নতিবিধানের উপায় করিয়াছে। এ সত্য আমরা বহুকাল হইতে জানিয়াছি। আজ ইংরাজ ব্যবসায় জগৎ হইতে এ সত্য প্রচারিত হইল। রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায় জগৎ যখন স্বার্থের প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাতে বিধ্বস্ত তখন একটা ক্ষুদ্র স্বার্থ আর সত্য প্রকাশের অন্তরায় হইল না।

এখন শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি বাস্তবিক অবলম্বিত হইবে কি না তাহা অন্য কথা। ইংলণ্ডে ইতিমধ্যেই শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট একটা প্রকাণ্ড রং তৈয়ারী করিবার কারখানা যাহাতে স্থাপিত হয় তাহার আয়োজন করিতেছেন, নিজেই অনেক অংশ ক্রয় করিবেন বলিয়াছেন, এবং সমস্ত মূলধনের উপর একটা সুদ দিবারও দায়িত্ব লইয়াছেন।

কিন্তু এদেশে শিল্পসংরক্ষণ কথায় হইয়াছে, কাজে এখনও কিছু হয় নাই।

ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়ে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বিলাতী কাপড় দেশে আসিতেছে না, তবুও দেশী মিলের কাপড় কর (excise duty) দিতেছে। জাহাজ অভাবে চীনের

সহিতও ব্যবসায় বন্ধ হওয়াতে, অনেক বোম্বাই মিল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের উপর কর উঠাইয়া দিলে দেশীয় মিলগুলির অবস্থা কিছু ভাল হইত সন্দেহ নাই। যুদ্ধের জন্য মিলের তৈয়ারী সুতা বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে না; তাহাতে আমাদের তাঁতীদেরও নিশ্চয়ই সুবিধা হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথাই হয় নাই।

নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়েই ইউরোপের বিট চিনির ব্যবসার উন্নতিলাভ করিয়াছিল। আমাদের আকের চিনির ব্যবসায়ের তখন হইতেই অবনতি। কাপড়ের ব্যবসায়ের মত চিনির ব্যবসায়ে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা নাই। এই যুদ্ধের সময় যদি আমাদের দেশে আকের চিনির শিল্প ও ব্যবসায় সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে অচিরেই জার্ম্মাণীর ও অষ্ট্রীয়ার বিটচিনির ব্যবসা চিরকালের জন্য ধ্বংশপ্রাপ্ত হইতে পারে আশা করা যায়। দেশীয় চিনির ব্যবসায় সংরক্ষিত করিতে গেলে, কৃষকদিগকে আক উৎপন্ন করিবার জন্য অর্থ দিতে হইবে, চিনির কারখানার জন্য বিনা খাজনায় বিস্তৃত আকের জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে, আক ও চিনির জন্য রেলের ভাড়াও কমাইয়া দিতে হইবে। বিদেশীয় বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদানের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। চিনির কারখানার মত পশমী কাপড়, কাগজ, কাচ ও রংয়ের কারখানা ও নানা অনুরূপ উপায়ে সংরক্ষিত হইতে পারে।

বাণিজ্য-সংরক্ষণ

কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে মারোয়ারী ধনীগণ মফঃস্বলের

ব্যবসায়ীদিগকে যে মূলধন ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে। কাহারও নিকট তাহারা টাকা বাকী রাখে নাই। বাজারে তাই টাকার টানাটানি। গভর্ণমেণ্ট এ জন্য সভারেন দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ব্যবসার মহলে যে একটা আতঙ্ক রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য-সংরক্ষণ প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট স্বদেশী ব্যাঙ্ক-গুলিকে এখন যদি অর্থ সাহায্য করেন তাহা হইলে ব্যবসায়ীগণ একটু সুস্থচিত্ত হইতে পারে। টাকা এখন ঘরমুখো হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট এ সময়ে ব্যাঙ্কদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলে ব্যবসার ক্ষেত্রে অনিশ্চিততা ও অবিশ্বাস দূর হইবে, এবং টাকা ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্যবসার কাজে লাগিবে, সন্দেহ নাই।

আরও অনেক উপায়ে বাণিজ্য সংরক্ষিত হইতে পারে। মিসর দেশে যে তুলা বিক্রয় হইতেছে না গভর্ণমেণ্ট তাহা ক্রয় করিয়া লইতেছে অথবা খরিদ্দারদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া তুলা ক্রয় করিতে উৎসাহ দিতেছে। বাংলাদেশে পাট ও দক্ষিণভারতবর্ষে তুলা বিক্রয় না হওয়াতে কৃষকগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে, অনেক স্থান হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ আসিতেছে। পাট ও তুলা গভর্ণমেণ্ট নিজে ক্রয় করিয়া লইলে * অথবা দেশীয় কোন ব্যবসার-অনুষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করিয়া ক্রয় করিতে উৎসাহ প্রদান করিলে কৃষকেরা রক্ষা পাইবে।

---

* যব ক্রয় করিবার প্রস্তাব উত্থাপনের বহুপূর্ব্বে ইহা লেখা হইয়াছিল।

কত উপায়ে যে শিল্প ও বাণিজ্য সংরক্ষিত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। উল্লেখ করিয়াই বা কি হইবে? এ সম্বন্ধে যদি প্রয়াস লক্ষিত হইত তবে একল বিষয়ের আলোচনার সার্থক হয়।

তথাপি আর একটি উপায়ের উল্লেখ না করিয়া আলোচনা শেষ করিতে পারিথাম না। অন্যদেশ অপেক্ষা জার্ম্মাণী আমাদের দেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চামড়া ক্রয় করিয়া থাকে:—

	রপ্তানির শতকরা অংশ
গরুর চামড়া	৪৮.৩
ছাগলের চামড়া	৩৪

যুদ্ধের সময় আমাদের দেশ হইতে চামড়া আর রপ্তানি হইতেছে না। অথচ জুতার দাম খুব বৃদ্ধি পাইতেছে; যুদ্ধেতে অধিক জুতা যে প্রয়োজন হইবে তাঁহা বলা বাহুল্য। এই সময়ে চামড়ার কারখানাকে যদি গভর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য প্রভৃতি নানা উপায়ে উৎসাহ প্রদান করে তাহা হইলে আমাদের একটী শিল্প অন্ততঃ জার্ম্মাণীর ব্যবসায়ের স্থান পুরণ করিতে পারিবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে শিক্ষালাভ

দেশে শিল্প ও ব্যবসায় সত্য সত্যই সংরক্ষিত হউক বা না হউক বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে আমরা শিক্ষা করিলাম:—

(ক) কখনও কোন দেশের পক্ষে খাদ্য-শস্য চাষের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় বাণিজ্যোপযোগী উপকরণ-শস্যের চাষ বাঞ্ছনীয় নহে; কৃষকগণ সাময়িক স্বার্থের জন্য উপকরণ-শস্য প্রভূত পরিমাণে

উৎপন্ন করিলে অবাধ উপকরণ-শস্য চাষ সংযত ও খাদ্য শস্য চাষকে সংরক্ষিত করিতে হইবে।

(খ) শুধু কৃষিকে যে সংরক্ষিত করিতে হইবে, তাহা নহে; শিশু শিল্পের পুষ্টিসাধনের একমাত্র উপায় সংরক্ষণ। ইংলণ্ড ও তদধীন ভারতবর্ষ ব্যতীত প্রত্যেক দেশই শিল্প সংরক্ষণের দ্বারা শিল্প সমূহের উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইংলণ্ডও এক্ষণে শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছে।

(গ) বাণিজ্যকেও সংরক্ষিত করিতে হইবে। ব্যবসায়ের জন্য মূলধন জোগাইয়া এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য অর্থ সাহায্য (bounties) করিয়া দেশীয় বাণিজ্য ও বিদেশে বাণিজ্যের পুষ্টি-সাধন করিতে হইবে।

শিল্পরক্ষা সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য

শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনের জন্য শিল্প ও ব্যবসায় বিদ্যাকে সংরক্ষিত করিতে হইবে। উপযোগী শিল্প-ব্যবসায়-বিদ্যার প্রসার ভিন্ন শিল্পোন্নতি একেবারেই অসম্ভব। বিশেষতঃ যে রাসায়নিক বিদ্যোন্নতি ভিন্ন উন্নত কৃষি ও শিল্পকর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তন অসম্ভব তাহার উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। শুধু শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা প্রচার নহে, ব্যাঙ্ক রেল ও জল পথের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, শ্রমজীবি-সংঘটন প্রভৃতি নানা দিকে সমাজের দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। শিল্প ও কৃষিকর্ম্মের পুষ্টিসাধন কল্পে ব্রতী হইলে সমাজ ক্রমশঃ নূতন নূতন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বদ্ধপরিকর হইবে।

সমাজ তখন ব্যক্তির সহিত একটা নূতন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। সমাজের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে, সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন, ব্যক্তিজীবনের প্রধানতম লক্ষ্য হইবে সমাজ জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধন। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণীতে তাহাই এক প্রকার হইয়াছিল, তাহারই ফলে জার্ম্মাণ-সমাজ শিল্প ও ব্যবসারক্ষেত্রে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের এত উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিল, তাহারই ফলে জার্ম্মাণীতে ব্যক্তি সমাজের নিকট আপনাকে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া কখনও তাহার স্বাধীনতা হারায় নাই। ভাবুকপ্রবর হেগেল ব্যক্তির সহিত সমাজের এই নূতন সম্বন্ধের বাণী প্রচারক, আধুনিক জার্ম্মাণীর জাতীয় জীবনের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহৎ তাহারই মূলে, ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধের যে নীতি হেগেল প্রচার করিয়াছেন তাহাই। লর্ড হ্যালডেন এ সম্বন্ধে তাহার দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ব্যবসায় প্রচারক

আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের সংরক্ষণ কাহারা করিবেন? দেশে যেমন শিক্ষা প্রচারক পরহিতব্রত সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছেন, সেরূপ ব্যবসাক্ষেত্রেও ত্যাগী প্রচারক আবশ্যক। ধনী ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে যত দিন না এমন শ্রেণীর ত্যাগী দেখা যায় যাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব দেশের ব্যবসায়ের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিবেন, ততদিন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি অসম্ভব। যাহা রুশিয়ায়

পীটার দি গ্রেট করিয়াছিলেন, যাহা জার্ম্মাণীতে ও জাপানে রাষ্ট্র করিয়াছে, বরোদা রাজ্যে গেইকুয়ার করিতেছেন, সেই মহাকর্ত্তব্য সাধনের গুরুভার ভারতবর্ষের ধনী ভূম্যধিকারিদিগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। আমাদের বাংলা দেশের ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কেহ কি আপনার সর্ব্বস্ব সমস্ত ধনজন সম্পদ দেশের কল্যাণ ব্রতে নিয়োগ করিয়াছেন? দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের অকৃত্রিম সেবক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ছাড়া আর কাহারও নাম আমাদের মনে আসে না, যিনি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্যবসায় উন্নতির জন্য পণ করিতেছেন।

সম্পূর্ণ

শুদ্ধিপত্র

—:*:—

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
ভূমিকা (গ)	১১	কল্পনা
ঐ	১৭	সাহিত্যের মূল
১৪২	৮	কাল ও দুঃখে
২:৩	১৫	করিয়া বলিব, তাহা
২৩৯-২৪৭		অধ্যায়ের নাম, "বর্ত্তমান যুদ্ধ ও স্বদেশী"

Opinions.

"দরিদ্রের ক্রন্দনে" যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সকল বিষয় এবং অন্য বিষয় লইয়া গ্রন্থকারের The Foundations of Indian Economics নামক বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি Longmans, Green and Co, London ছাপিতেছেন। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে Dr. Brajendranath Seal M. A., লিখিয়াছেন,

Professor Radhakamal Mukherji's work is a valuable contribution to the study of the basal factors in Indian economic life and organisation. As a systematic compilation of economic data relating to the Cottage industries of India, it is highly informing and interesting. But it is far more than a compilation. It contains some interesting information derived from a first hand study and actual investigation on the spot of several Indian crafts and village industries. This direct touch with the craftsman in the village is indispensable to every genuine student of the existing Indian economic organisation and it is the absence of such personal knowledge that gives

their airy, unsubstantial and often erratic character to many of the elaborate theoretic strictures and schemes of the amateur economlst in the closet. Besides a close familiarity with the details of the existing organisation of industry, trade and transport, Mr. Mukerji shows a keen grasp of the principles that should guide the Indian economic evolution in the present stage. In fact his ideas on the place of the cottage and village industries in Indian economic life, with his analysis of the causes of their decline and his suggestians for their improvement. are more in accord with sound and advanced ideas of economic science than the extreme views of the rival schools that hold the field to day. And Mr. Mukerjee's study of the social factor of this economic life, such as caste, caste education, and the apprentice system, the family as an economic unit and the Indian systems of inheritance and succession, is more informing and more suggestive than the vague generalities with which we are treated on these well worn subjects by our amateur theorisrs.

৩/০

THE REVIEW OF REVIEWS.

Under this mournful title Radhakamal Mukherji contributes a jeremiad. The theme is the decline of village life—not in the Home counties, but in India, where the cities exercise the same fascination as elsewhere. This is a matter of special concern, for the writer states :—

India is the land where the village and not the city has been the centre of civilisation in the past In India, more than in any other country the great intellectual, social, and religious movements have originated in villages and nurtured by their thoughts and aspirations at last reached the cities. The soul of India is to be found in the village, not in the city.

Mr. Mukherji gives a suggestive account of the old conditions which one by one disappear changing the whole fabric of social life :—

Nor can we overestimate the evil effects of the migration of the middle class on the social life of the village. There was in every village an arbitration court conducted by men of leading in the village

which decided petty quarrels and disputes and even contributed largely to promote amity and fellow-feeling among the villagers. The arbitration court has been dissolved as the influential persons have left the village, and party feeling and animosity have become rife in the village. The spirit of association and fellow-feeling which characterised our village population is disappearing. Large snms are now squandered away to fight lawsuits which could easily have been decided by the arbitration court. Again, village institutions which were previously supported by village funds and labour are decaying. Village temples are without repairs. Rivers have silted up and weeds have grown thick on them. No new tanks or wells are dug and good drinking water is scarce. Cattle die by hundreds and cholera rages as an epidemic everywhere in hot season. Schools have been closed. The house-holder's habit of setting apart a handful of alms everyday to defray the cost of a school or a religious festival is being discontinued. The middle class has left the village for food and there

are none to teach the value of self-help and co-operation and to fight against mutual distrust and apathy. Those who keenly looked after the welfare of every villager, shared their joy with him on a merry occasion and consoled him in his sorrow, whom every villager regarded with a feeling both of awe and reverence, are now gone for ever. To whom shall the villager now turn in his need ?

A. B. Patrika.

The article on the revival of village civilisation is, as may be expected, characterised by ripe scholarship and deep reflectivenss and leavened with the yeast of genuine patriotism.

পল্লীসেবক

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ অধ্যাপক—ধনবিজ্ঞান, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর প্রণীত।

উদ্বোধন; শ্রাবণ, ১৩২০

পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয় ভারতবর্ষের পল্লীসমূহের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন-পন্থা নির্দ্দেশ। গ্রন্থকারের মতে পল্লীগ্রামই দেশের শক্তি ও সভ্যতার কেন্দ্র "ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্য পল্লী-

জীবনের চিন্তা এবং কর্ম্মপ্রণালীর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।" প্রাচীন ভারত যে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা এই "পল্লীগ্রাম এবং নগরজীবনের মধ্যে এরূপ ভাবের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ থাকায়" বর্ত্তমানে "পল্লীগ্রাম এবং নগরের পূর্ব্বেকার ভাববিনিময়ের সামঞ্জস্য আর নাই। নগরগুলিই এখন দৃষ্টান্তস্থল এবং পল্লীগ্রাম তাহার অনুগামী মাত্র।" গ্রন্থকার বলেন, "ভারতবর্ষ আধুনিক ইউরোপকে অনুসরণ করিয়া তাহার পল্লীজীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে।" কেন না, "পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক উন্নতি বাণিজ্যব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এজন্য সেখানে সহরগুলিই সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ।" পক্ষান্তরে "ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতির উপর ভারতবর্ষের জাতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে ...... কৃষিকার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।......এজন্য ভারতবর্ষের সভ্যতা পল্লীগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল সহর রাজধানীতে নয়।" সুতরাং "ইউরোপকে এ বিষয়ে অন্ধ অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ কাজ।" ভারতবর্ষের উন্নতি "ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা"য়। বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য—"ভারতবর্ষের পল্লীজীবন আজকালকার নূতন অবস্থার উপযোগী" করিয়া গঠন করা, "ইউরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বৈরাগ্য" সম্মিলিত করা, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই মহামিলনের (বিজ্ঞান-বৈরাগ্যের) কেন্দ্রস্থল" পল্লীগ্রামকে করা। এই গেল থিওরি (Theory)।

উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

প্রথমতঃ কয়েকটি পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করা (১) যৌথ ঋণদান-মণ্ডলী, (২) যৌথ শস্য-ভাণ্ডার (৩) যৌথ ক্রয়বিক্রয়-মণ্ডলী (৪) কৃষিকার্যের সমবায় ইত্যাদি। এক কথায় "অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পন্থার প্রয়োজন।"

এইরূপ অনুষ্ঠানের ফল হইবে "পল্লীর দারিদ্র্য দূর," "স্বাস্থ্য লাভ," "আত্মনির্ভরতা-লাভ," "আত্মশক্তির উপলব্ধি" "কর্ম্মশক্তির উদ্বোধন," "পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি," এবং "সমবায় প্রকৃতির জাগরণ।"

এই গেল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা। তার পর "ভারতবর্ষীয় বৈরাগ্যে"র উদ্বোধনার্থ অনুষ্ঠান (১) "আমাদের এই সনাতন প্রেম, সৌহার্দ্দ্য, মিলন ও আত্মনির্ভরতা অনেক বৎসর দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। এখন আমাদিগকে আমাদের পুরাতন জিনিষই নূতন নামে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

(২) পল্লীসেবক এবং তাঁহাদের দ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, টোল প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, সেবা-সমিতি, সুহৃৎ-সমিতি—মদ্য-পাননিবারণী সভা প্রভৃতির স্থাপন।

পল্লীসেবকগণ পল্লীর শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবেন, এক কথায় "পিতাস্বরূপ" হইবেন, ইহারা "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পারদর্শী হইবেন।"

এইরূপে "পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে পারদর্শী ভারতবর্ষের"পল্লীসেবকগণ

বিজ্ঞান-সাহায্যে ভারতীয় পল্লীজীবনের দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া এক বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া দিবেন··· ··· ·····বিশ্ব জগৎকে একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন উপহার দিবেন।”

পুস্তিকার উদ্দেশ্য মহৎ। পল্লীর উন্নতির জন্য প্রবন্ধ-লেখক যে সব পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলির কতকগুলিও যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে দেশের দুরবস্থার কতকটা অবসানের উপায় হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার ও আলোচনা প্রার্থনীয়।

হাবলুল মাতিন

অধ্যাপক রাধাকমলের “পল্লীসেবক” পাঠ করিলে স্বাভাবিকই মনে হয় আমাদের সম্মুখে এত কাজ আমাদের মধ্যে এত দীনতা ও হীনতা, আর আমরা কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়া বসিয়া আছি! সুযোগ্য অধ্যাপক কেবল দুঃখের করুণগীতি গাহিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার দেশের যুবকবৃন্দকে হিন্দু মুসলমাননির্ব্বিশেষে দেশের স্বাস্থ্য, পানীয়, ব্যবসা, বিদ্যা, কৃষি সকল দিকেই কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বেশ নিপুণভাবে সকলের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তবে এখন কথা—দেশের যুবকগণের স্বার্থ-সর্ব্বস্বতা এখনও দূর হইবে কি না, তাঁহারা স্বার্থের লোভ ছাড়িয়া এখনও দেশমাতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবেন কি না।

রংপুর দিক্‌প্রকাশ, ১৬ই কার্ত্তিক ১৩২

আমরা বহুদিন হইল এই পুস্তকখানি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি, কিন্তু যথাসময়ে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত। পুস্তকখানি ৩৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী, দুই তোলার বেশী হইবে না; কিন্তু পড়িতে যাইয়া দেখি গ্রন্থকার দুইমণ দুধ শুকাইয়া এই দুই তোলা ক্ষীর আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক কথায়, শতচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিনটিহ যুগপৎ মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়া এক মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া তোলে। এক প্রাচীন ভারতে নগর ও পল্লীর অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে গেলেই দিক্‌-প্রকাশের দুইচার স্তম্ভেও কুলাইয়া উঠে না। সুদূর অতীতের কুজ্ঝটিকাময় কুক্ষিমধ্যে তদানীন্তন গ্রাম ও নগরের অবস্থা অতিশয় অস্পষ্ট। ভরতের "বিপ্রাদিবর্ণপ্রায়া প্রাকারপরিখাদিরহিতা বহুজনবসতিঃ!" বা শ্রীধর স্বামীর "হট্টাদি শূন্যবসতিঃ!" অথবা মার্কণ্ডেয় পুরাণের "তথা শূদ্রজনপ্রায়া সুসমৃদ্ধকৃষীবলা। ক্ষেত্রোপযোগভূমধ্যে বসতিগ্রামসংজ্ঞকা" প্রভৃতি কথাতেও সেকালের গ্রামের একটা চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত হয় না। বস্তুতঃ "স্বর্গগ্রামটিকা বিলুণ্ঠনবৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ" প্রভৃতি দুই একস্থল ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রামের উল্লেখ খুব কমই পাওয়া যায়। আমরা গ্রন্থকারের নিকটেই এই সকল বিষয়ের একটা যথা সম্ভব পূর্ণ চিত্র পাইবার আশা করি। যতদিন আমাদের এই আশা পূর্ণ না হইতেছে,

ততদিন এই মানস অনুসন্ধান-রশ্মির (সার্চ্চ লাইট) অস্পষ্ট আলোক-চিত্রাবলী ও তাহাদের আপেক্ষিক সমালোচনা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রক্ষিত হউক, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

প্রবাসী

পল্লী ভারতের সভ্যতা সমাজও প্রাণের কেন্দ্র ছিল; য়ুরোপীয় সভ্যতার আঘাতে সেই পল্লী উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের আর ভদ্রস্থতা নাই। তাহা রক্ষার জন্য পল্লীসেবকের প্রয়োজন; তাঁহারা কৃষক ও পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, যৌথ ঋণদান সমিতি গঠন করিয়া কৃষকদিগকে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, এবং সহরের ঘূর্ণীপাক হইতে পল্লীকে দূরে বাচাইয়া রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। রাধাকমল বাবু এই মত নানা প্রবন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায়ই প্রচার করিতেছেন। তাঁহার এই মত যে সমীচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষাপ্রচার

দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ।০ আনা। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি, এইচ ডি, ডি এস্, সি আই ই, এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, প্রকাশক শ্রমজীবি-শিক্ষা-পরিষৎ।

সুরমা উপত্যকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক "সুরমা" ২৩শে আষাঢ়ের সংখ্যায় লিখিয়াছেন, জীবন ঝটিকার সংগ্রামক্ষেত্রে অবস্থান

করিয়া যাঁহারা এই পতিতদেশের গতি স্থিতি পরিণতির বিষয়ে মস্তিষ্কক্ষয় করা কর্ত্তব্য মনে করেন রাধাকমল ও রাধাকুমুদ দেশের সেই সুসন্তানগণের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশে যে সকল নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাদিগের ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি * * রচিত হইল। নৈশ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই ইহা বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এবং অনুষ্ঠানের উপর সুধাবৃষ্টি হউক—যিনি দেশের গরীব লোকের জন্য এতটুকু অগ্রসর হইতে পারেন, তিনি ধন্যজন্মা। * * পুস্তকের ভাব, ভাষা, নীতি, প্রবন্ধযোজনা, চিত্রসংস্থান সকলই গ্রন্থকারের নামের উপযোগী হইয়াছে।"

লোকশিক্ষা সম্বন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় "শিক্ষা প্রচারের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"সমাজের অসংখ্য লোক একেবারেই মূঢ় মূক,—দেশের কোন চিন্তা কোন আলোচনাই তাহাদিগকে স্পর্শ করে না—চারিদিকে কত আলো, কত ভাবের আবেগ, কিন্তু কই উহাদিগের ত কোন চেতনাই নাই। এই শ্যামল সুষমা সৌন্দর্য্যভরা দেশে কে যেন উহাদিগের মুখে দুঃখ বিষাদের কালিমা চিরকালের জন্য ঢালিয়া দিয়াছে।" * *

"আমরা যে আলোক পাইয়াছি তাহা আমাদিগের অনুন্নত ভ্রাতৃগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।" * * *

"সমাজের যে শ্রেণীর মধ্যে প্রতিভা থাকুক না কেন, শিক্ষার দ্বারা উহার বিকাশ হওয়া আবশ্যক, যে দরিদ্র সেও যাহাতে

আপনার উন্নতিসাধন করিতে পারে তাহার জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক।"

মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী

দেশের শ্রমজীবিগণকে তাহাদের জীবনোপায়ের সাহায্যকল্পে লেখা-পড়া এবং নানাবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সুযোগ্য প্রোফেসার বাবু রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, মহোদয় স্থানীয় কতিপয় সুশিক্ষিত যুবকগণের সহযোগে নানাস্থানে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা উদ্যোগ করিতেছেন। রাধাকমল বাবু নিজের বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া এবং স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ মাসে মাসে ব্যয় করিয়াও এই দেশহিতকর ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহার কার্য্যে আড়ম্বর নাই, জাঁকজমক নাই, বাকপটুতা নাই, সভা-সমিতি নাই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি নাই; আছে—কার্য্যতৎপরতা ও উৎসাহ। তিনি যথোপযুক্ত মহাত্মাগণের নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া কার্য্য-পরিচালনের সহায়তা চাহিতেছেন, অল্প দিন মধ্যেই তিনি বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর মধ্যে গোরাবাজার, কাদাই, সৈদাবাদ এই তিনটী স্থানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গোরা-বাজার বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ৮৫ জন, কাদাই বিদ্যালয়ে ৬০ জন, সৈদাবাদ বিদ্যালয়ে ৪০ জন হইয়াছে। কেবল মাত্র সহরেই তাঁহার অভিপ্রায় সীমাবদ্ধ নাই, পল্লীগ্রামেও তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হইয়াছে, তাঁহার "পল্লীসেবক" পুস্তক পাঠ করিলেই সকলে বিশেষ-

রূপে বুঝিতে পারিবেন তাঁহার উদ্দেশ্য কতমহৎ। ইতিমধ্যে দশটী পল্লীতে দশটী অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে শ্রমজীবী বালক ও যুবকগণকে নিয়মিত পাঠাদি এবং শিল্প শিক্ষা দিতেছেন। নিম্নলিখিত পল্লীগুলিতে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

চৌতাপুর, বেণীদাসপুর, মদনপুর, সেখালীপুর, বহুরুল, সোমপাতা, বীরচন্দ্রপুর, মণীগ্রাম, জঙ্গীপুর, পশ্চিমগামিনী, সম্প্রতি এই দশটী পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি সমস্তমুর্শিদাবাদ জেলার এবং তৎদৃষ্টান্তে বিভিন্ন জেলার সমস্ত স্থানেই যাহাতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পল্লীগ্রামের উদ্যোগী উৎসাহী যুবকগণ স্ব স্ব পল্লীর গরীব প্রতিবাসিগণের হিত ইচ্ছা করিয়া যদি রাধাকমল বাবুর সহায়তা চান, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আনন্দের সহিত সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। পাঠ্য পুস্তকাদি সম্বন্ধেও তিনি পরমুখাপেক্ষী হন নাই। এ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অশেষ উপকার করিতেছেন। তাঁহার প্রণীত "শিক্ষাপ্রচার" নামক পুস্তকখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকের স্থানে স্থানে ছবি দেওয়ায় শিক্ষার্থিগণের উৎসাহ এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ইচ্ছা প্রবল করিয়া দেয়। এই প্রকার পুস্তক সকল বিদ্যালয়েরই প্রথম পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। রাধাকমল বাবুর ন্যায় দেশের সমস্ত শিক্ষিত যুবকগণের স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মপটুতার প্রবৃত্তি যতদিন না আসিবে, ততদিন দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না।

গ্রন্থকারের The Foundations of Economics নামক গ্রন্থ Longmans, Green and Co কর্ত্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। দেশের বর্ত্তমান বৈষয়িক সমস্যা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি এই গ্রন্থে পাইবেন।

সাহিত্যে যুগধর্ম্ম

(যন্ত্রস্থ)

সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধ-আলোচনা। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্য কি ভাবের সাম্রাজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব ও অভিযোগের কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে।"

—বিবেকানন্দ